দেখিয়া দুঃখিত ও ক্ষিপ্ত হইলেন।

প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হইল– তাহার পরওয়ারদেগার আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে জারি করা ও জারি রাখার জন্য সর্বপ্রথম নিজের যথাসর্বস্ব এবং সর্বাত্মক চেষ্টা তদবীর ব্যয় করা। এই হিসাবে ছোলায়মান (আঃ) সৈন্য বাহিনীর শৈথিল্য দৃষ্টে নিজ কর্তব্য পালনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশপূর্বক নিজস্ব বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করিলেন। আল্লাহর দ্বীনের জন্য জেহাদ করার ব্যাপারে শৈথিল্য দৃষ্টে দুঃখে ও ক্ষোভে জর্জরিত হযরত ছোলায়মান স্বীয় ঘোষণার মধ্যে আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপন বোধক বাক্য "ইনশাআল্লাহ" বলিতে ভুলিয়া গেলেন। ব্যাপারটা সামান্য ও স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল; তাঁহার চুল পরিমাণ ত্রুটি আল্লাহর দরবারে পাহাড় তুল্য গণ্য হইল এবং আগামীর জন্য সতর্ককরণে আল্লাহ তাঁহাকে ভুলের মাসুল ভোগের সম্মুখীন করিলেন– তাঁহার ঘোষণাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

ছোলায়মান (আঃ) স্বীয় ঘোষণার ব্যর্থতা দৃষ্টে নিজ-ত্রুটি স্মরণ করিয়া আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়িলেন এবং আল্লাহর তায়ালার নিকট অপ্রতিহত রাজশক্তি লাভের দরখাস্ত করিলেন, যেন আল্লাহর দ্বীন জারী করিতে কোন বাধা থাকিতে না পারে। অন্তর্যামী আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বীন জারী করার জন্য হযরত ছোলায়মানের সাধনা, এখলাছ দৃঢ় নিয়্যত এবং সর্বসাধ্যে প্রচেষ্টা দৃষ্টে তাঁহাকে সেইরূপ শক্তি দান করিলেন– দেও, জ্বীন, বাতাস প্রভৃতি মহাশক্তিসমূকে তাঁহার করতলগত করিয়া দিলেন।

হযরত ছোলায়মানের মৃত্যুর এক আশ্চর্য ঘটনা

ছোলায়মান (আঃ) বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদ পুনঃনির্মাণ করিতেছিলেন, এখনও নির্মাণ কার্য শেষ হয় নাই এমতাবস্থায় হযরত ছোলায়মানের জন্য নির্ধারিত মৃত্যু-সময় নিকটবর্তী হইল এবং তিনি তাহা অবগত হইলেন। মসজিদ নির্মাণে নিয়োজিত ছিল একদল জ্বিন, যাহারা সাধারণতঃ দুষ্ট ও দুর্ধর্ষ হয়; কোন রকম জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা ছাড়া কাহারও আয়ত্বে থাকিয়া কাজ করিয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে অসহনীয়। এস্থলে হযরত ছোলায়মানের খোদা-প্রদত্ত শক্তির প্রভাব তাহাদিগকে পদানত ও কার্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিল।

মসজিদ নির্মিত হওয়ার পূর্বেই যখন হযরত ছোলায়মান তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্তী বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি আশঙ্কা করিলেন, এই অবস্থায় আমার মৃত্যু ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ধর্ষ জিনগণ কার্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, মসজিদ নির্মাণ অসম্পূর্ণ থাকিবে। এদিকে মৃত্যুর নির্ধারিত সময় অনড় ও অটল, এক সেকেন্ড এদিক-ওদিক হইতে পারে না।

ছোলায়মান আলাইহিচ্ছালামের নীতি ছিল, তিনি নির্জন কক্ষে একাধারে দীর্ঘ দিন আল্লাহর এবাদত ও ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, লোকদের মেলামেশা ত্যাগ করিয়া থাকিতেন, কিন্তু সকলের উপর তাঁহার যে, ভয়ানক প্রভাব ছিল উহার প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত কাজ-কর্ম সঠিকরূপে চলিত, কোন বিঘ্নের সৃষ্টি হইত না।

হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু অতি নিকটবর্তী আসিয়া গেলে তিনি তাঁহার পূর্ব প্রচলিত প্রথার দ্বারা কাজ নেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাঁহার রীতি অনুযায়ী একটি নির্জন কক্ষে এবাদত ও আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হইলেন। এইবার যেহেতু মৃত্যুর সম্মুখীন, তাই তিনি একটি লাঠির উপ এরূপ ভর করিয়া রহিলেন যেন মৃত্যু ঘটার পরও তাঁহার দেহ মাটিতে না পড়িয়া স্থির থাকে। নিজে এই ব্যবস্থা অবলম্বনপূর্বক আল্লাহ তাআলার দরবারেও দোয়া করিলেন যে, বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদের নির্মাণকার্য যেন পূর্ণরূপে সমাধা হয়।

নির্ধারিত সময়ে হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু হইয়া গেল, কিন্তু তিনি নির্জন কক্ষে এবাদতে মশগুল আছেন বলিয়াই সকলের ধারণা, তাই কেহ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারিল না এবং সকলেই নিজ নিজ কার্যে নিয়োজিত থাকিল।

---

* পূর্বে ৭০ সংখ্যার উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু নব্বই সংখ্যার মতামতই অগ্রগণ্য।

সমস্ত নবীগণেরই বিশেষত্ব যে, তাঁহাদের মৃত দেহের উপর কোন প্রকার বার্তন আবর্তন ঘটে না। তাই হযরত ছোলায়মানের দেহ অপরিবর্তিত অবস্থায় স্থির রহিয়া গেল। সকলেই তাঁহাকে পূর্ব প্রচলিত রীতি অনুযায়ী জীবিত এবং এবাদত ও ধ্যানে মশগুল ভাবিয়া কাজ-কর্ম চালাইয়া যাইতে লাগিল। দুর্ধর্ষ জ্বিন যাহারা মসজিদ নির্মাণে নিয়োজিত ছিল তাহারাও দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া যাইতেছিল। বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদ সম্পূর্ণ হইয়া আসিল, এদিকে হযরত ছোলায়মানের লাঠি যাহার প্রতিরোধে তাঁহার মৃত দেহ স্থিতাবস্থায় ছিল সেই লাঠিতে ঘুণ-পোকা লাগিয়া উহা খাইতে আরম্ভ করিল।

আল্লাহ তায়ালার কুদরতে এক দিকে মসজিদের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হইল, অপর দিকে ঘুণ-পোকার দরুন লাঠির প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল; লাঠি ভাঙ্গিয়া হযরত ছোলায়মানের মৃত দেহ মাটিতে পড়িয়া গেল। লোকজন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু হইয়াছে এবং লাঠির উপর ঘুণ-পোকার ক্রিয়া-কার্যের অবস্থা দৃষ্টে সকলেই অনুভব করিল যে, অদ্য হইতে বহুদিন পূর্বেই হযরত ছোলায়মানের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু আলেমুল-গায়েব আল্লাহ ভিন্ন কেহ তাঁহার মৃত্যু জ্ঞাত হইতে পারে নাই।

আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক একটা লীলার দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের সমাধা হইয়া যায়। এখানেও এই লীলার মাধ্যমে মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়া ছাড়াও একটি জটিল বিষয়ের মীমাংসা হইল। জ্বিনদের সম্পর্কে সাধারণ লোকদের এবং জ্বিনদের নিজেদেরও ধারণা ছিল– তাহারা গায়েবী খবরাখবর অবগত থাকে। আলোচ্য ঘটনায় এই অমূলক ধারণার অসাড়তা প্রমাণিত হইল। জিনগণ যদি গায়েবী খবর অবগতই থাকিত, তবে তাহাদের চোখের সম্মুখে হযরত ছোলায়মানের মৃত্যুর ঘটনা অজ্ঞাত থাকিতে পারিত না এবং তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হযরত ছোলায়মানের দরুন তাহারা যে সব কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত ছিল সেই সব পরিশ্রমে তাহারা নিয়োজিত থাকিত না। উল্লিখিত বিষয়াবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۔

অনুবাদ ঃ আমি নির্ধারিত সময়ে ছোলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম, (এমন সুকৌশলে যে, তাঁহার মৃত্যু কাহারও অনুভূতই হইল না) একমাত্র ঘুন-পোকাই তাঁহার লাঠি খাইয়া তাহাদিগকে তাঁহার মৃত্যু অগত করিল। (ঘুণ-পোকার লাঠি খাওয়ায়) যখন তিনি পড়িয়া গেলেন তখন (কার্যে নিয়োজিত) জ্বিনগণ (তাঁহার সম্পর্কে অবগত হইল যে, তিনি ত বহুদিন পূর্বেই মারা গিয়াছেন এবং) বুঝিতে পারিল যে, যদি তাহারা গায়েবের খবর জানিত তবে এতদিন এই কষ্টদায়ক পরিশ্রমে তাহাদের আবদ্ধ থাকিতে হইত না।

(পারা– ২২, রুকু– ৮)

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ মৃত্যু যে নির্ধারিত সময় হইতে একটুও টলে না উল্লিখিত ঘটনার মধ্যে উহারই একটি বিশেষ নজীর দেখান হইয়াছে। ছোলায়মান আলাইহিস্ সালামের ন্যায় ব্যক্তি যিনি একদিকে ছিলেন বিশিষ্ট নবী, অন্য দিকে বিশ্ব-অধিপতি যাঁহার ক্ষমতা ও শক্তি ছিল অসাধারণ। সেই ছোলায়মান (আঃ) শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুকে উহার নির্দিষ্ট সময় হইতে হটাইতে পারিলেন না। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা অটল অনড় আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন।

لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً .....

"প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর সময় নির্ধারিত রহিয়াছে, সেই সময় উপস্থিত হইলে একটুও আগ-পাছ করার ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না।।" (পারা–১১, রুকু– ১০)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত ছোলায়মান আলাইহিচ্ছলামের যে অতুলনীয় ও অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন রাজত্ব

হাসিল ছিল তাহার একমাত্র সূত্র ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁআলার বিশেষ দান। যহার বিবরণ পূর্বালোচিত পবিত্র কোরআনের আয়াত সমুহের অনেক স্থানে উল্লেখ রহিয়াছে।

ইহুদিদের মধ্যে এই সম্পর্কে একটা মিথ্যা ভিত্তিহীন ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, হযরত ছোলায়মান (আঃ) যাদু-বিদ্যার সাহায্যে এই অসাধারণ শক্তি, সামর্থ ও রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই ধারণা ও বিশ্বাস ইহুদিদের মধ্যে অতি পরিপক্ক ও ব্যাপকভাবে ছড়াইয়াছিল, এমনকি ইহারই ফলে তাহারা নিজেদের ধর্মীয় কেতাব আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত আসমানী কেতাবকে পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া যাদু বিদ্যা শিক্ষায় লিপ্ত হইয়াছিল।

পবিত্র কোরআনের ১ম পারা– ১২ রুকুর সুদীর্ঘ বিবরণে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা উক্ত ধারণার অসাড়তা ঘোষণা করিয়াছেন যে, যাদু– যাহা কুফুরী কাজ উহার সঙ্গে হযরত ছোলায়মানের কোনই সংশ্রব ছিল না।

দুনিয়া পরীক্ষার স্থল– ভাল এবং মন্দ, হালাল এবং হারাম, ঈমানের জিনিস, কুফরের জিনিস উভয়কেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা এই পরীক্ষার স্থানে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা ভাল তাহারা ভালকে অবলম্বন করিয়া কতৃকার্য হয়, পক্ষান্তরে যাহারা মন্দ তাহারা মন্দকে অবলম্বন করিয়া জাহান্নামের খোরাক হয়।

হক্ক ও সত্যকে বাছিয়া লইয়া উহাকে গ্রহণ ও অবলম্বন করার পরীক্ষাকল্পে আল্লাহ তা'আলা যাদু-বিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছেন। শয়তানরা মানব জাতিকে হক্ক ও সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে মানবকে ঐ যাদু শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে।

হযরত ছোলায়মানের আমলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ লাভের জন্য শয়তান শ্রেণীর জিনগণ ঐ যাদু-বিদ্যার বিশেষ প্রচার ও চর্চা করিতে থাকে; এমনকি শয়তানের দলবলরা বই পুস্তক আকারে যাদু-বিদ্যা প্রচার করিতে থাকে। হযরত ছোলায়মান যথারীতি এই শয়তানী কার্যেরও প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, হযরত ছোলায়মান যাদু-বিদ্যার সমস্ত বই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়া যথাসাধ্য ঐসবকে সংগ্রহ করতঃ সমস্ত বই পুস্তকগুলিকে স্বীয় কক্ষে সিংহাসনের নীচে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন কেহ উহাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে সাহসীই না হয়। কিন্তু হযরত ছোলায়মানের মৃত্যুর পর জ্বিন-শয়তানের দলেরা ব্যাপক প্রচার চালাইল যে, হযরত ছোলায়মানের অসাধারণ রাজত্ব একমাত্র যাদু-বিদ্যার সাহায্যেই ছিল। এমনকি লুক্কায়িত বই-পুস্তকগুলির অবশিষ্টাংশও বাহির করিয়া লোকদের মধ্যে মিথ্যা প্রচারণা চালাইল যে, এই দেখ ছোলায়মানের সিংহাসনের নীচে তিলিসমতি যাদুর বই-পুস্তক রহিয়াছে, যাহার বলে তিনি জ্বিন-পরী, দেও-ভুত, পশু-পক্ষী ও বাতাস ইত্যাদি করতলগত করিয়াছিলেন।

জ্বিন ও শয়তানের এই মিথ্যা প্রচারণা এবং হারাম ও কুফরী যাদু-বিদ্যা বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে বিশেষ ব্যবস্থাও প্রেরিত হইয়াছিল, যাহা হারুত ও মারুতের ঘটনারূপে পবিত্র কোরআনে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু দুনিয়া পরীক্ষার স্থল– এক শ্রেণীর লোক সব কিছুকে উপেক্ষা করিয়া জিন ও শয়তানের প্রচারণার উপরই বিশ্বাসী রহিল এবং যাদু-বিদ্যার পিছনে পড়িয়া রহিল। ইহাই ইহল মূল সূত্র ইহুদিদের এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণার যে, ছোলায়মান (আঃ) যাদু জানিতেন, যাহার সাহায্যে তিনি তাঁহার সবকিছু হাসিল করিয়াছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা এই মিথ্যা ও গর্হিত ধারণার বিরুদ্ধেই পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত বিবৃতির মধ্যে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়াছেন–

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ـ

"কুফরী কাজ (যাদু-বিদ্যাকে) ছোলায়মান কখনও (অবলম্বন) করেন নাই, বস্তুতঃ শয়তানরাই ঐ কুফরী (যাদু-বিদ্যার) কাজ করিয়াছিল; তাহারাই লোকদিগকে যাদুবিদ্যা শিখাইতেছিল।

হযরত লোকমান

পবিত্র কোরআনে "সূরা লোকমান" নামে একটি সূরা আছে এবং সেই ছুরার মধ্যে "লোকমান" নামীয় এক ব্যক্তির স্বীয় পুত্রকে প্রদত্ত কতিপয় মহৎ সদুপদেশ বিশ্ব-মানবের জন্য বিশেষ নজির স্বরূপ উল্লেখ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সুজ্ঞানী সুপন্ডিত হিসাবে "লোকমান হাকীম" নাম সচরাচর সাধারণেও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং তিনি যে, একজন অতি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তাহাও সর্ববিদিত। এমনকি তাঁহার সদুপদেশাবলী সম্বলিত **صد پند لقمان** ছদপান্দ লোকমান" অর্থাৎ লোকমানের এক শত উপদেশ পুস্তিকাটি সাধারণের প্রচলিত আছে।

এতগুলি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নাম হিসাবে এই নামের তাহ্কীক এবং গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

কাহারও মত এই যে, হযরত লোকমান স্বয়ং যুগের নবী বা পয়গাম্বর ছিলেন, কিন্তু এই মতামত অতি দুর্বল; ইহার উপর কোন প্রমাণ নাই। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও আলেমের মত এই যে, "লোকমান" নবী ও পয়গাম্বর ছিলেন না; তিনি একজন খোদাভক্ত পরহেজগার বড় বুজুর্গ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন।

লোকমান নামের অনেক লোকই ভূপৃষ্ঠে আসিয়াছে এবং তাহাদের মধ্য হইতে একাধিক ব্যক্তি এমনও হইয়াছিলেন, যাহারা পবিত্র কোরআনের অবতীর্ণ স্থল আরবে এবং বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুইজন। একজন ছিলেন খৃষ্টপূর্ব এয়োদশ শতাব্দীতে হযরত হুদ আলাইস্‌ সালাম পয়গাম্বরের বংশধর আ'দ জাতির মধ্যে; তিনি ছিলেন একজন অতি মহৎ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। দ্বিতীয় জনও অতি মহৎ সুজ্ঞানী, সুপন্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কাহারও মতে তিনি খৃষ্ট পূর্ব ১০ম শতাব্দীর পয়গাম্বর হযরত দাউদের যুগে কাজী তথা প্রধান বিচাপতির পদে মনোনীত ছিলেন। (কাছাছোল কোরআন ২-৩৮)

আমাদের আলোচ্য এবং পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত "লোকমান" কে ছিলেন সে সম্পর্কে উল্লিখিত দুইজন সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারও মতে দ্বিতীয় জন, কিন্তু অগ্রগণ্য মত ইহাই যে, প্রথমোক্ত লোকমানই পবিত্র কোরআনে আলোচিত লোকমান এবং তিনিই "লোকমান হাকীম" নামে সর্বপ্রসিদ্ধ ছিলেন।

পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত লোকমান হাকীমের আলোচনা নিম্নরূপ–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَّشْكُر فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ـ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ـ

নিশ্চয়ই আমি লোকমানকে সৎ, সূক্ষ্ম ও পরিপক্ক জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। তাহাকে আদেশ করিলাম, (আমার এই বৃহৎ দানের কৃতজ্ঞতায় তুমি আল্লাহর শোকর আদায় কর। (ইহা বাস্তব কথা) যে কেহ আল্লাহ তা'আলার শোকর-গুজারী করিবে সে বস্তুতঃ নিজের উপকারার্থেই শোকর-গুজারী করিবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ কুফুরী করে (তবে সে নিজেরই ক্ষতি করিবে।) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অপ্রত্যাশী, স্বয়ং প্রশংসিত।

وَاِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِاِبْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ـ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصٰلُه فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ـ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْس لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِىْ الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ـ وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ

فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

(লোকমানের পরিপক্ক জ্ঞানের পরিচয় হয়) যখন লোকমান তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দানে বলিয়াছিলেন (১) হে বৎস! আল্লাহর সঙ্গে শরীক ঠাওরাইও না, নিশ্চয় শেরেকী কাজ বড় অন্যায়, মহাপাপ। (আল্লাহ বলেন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর হক্কের ন্যায়) আমি মানুষকে তাহার (জন্মদাতা) মাতাপিতার হক্ক আদায় করিতেও বিশেষ তাকীদ করিয়াছি। তাহার মাতা তাহার জন্য কতই না কষ্ট করিয়াছে! মাতা তাহাকে পেটে রাখিয়া তাহার বোঝা বহন করিয়াছে– দিন দিন দুর্বলতার উপর দুর্বলতার মধ্যে। তারপর কোলে-কাঁধে রাখিয়া দুগ্ধ পান করাইয়াছে; দুগ্ধ ছাড়াইতেও দুই বৎসর কাটিয়াছে। সুতরাং আমি মানুষকে আদেশ করিয়াছি, আমার শোকর আদায় কর এবং তোমার মাতা-পিতার শোকর আদায় কর; (আদেশ লংঘন করিও না) আমার নিকট ফিরিয়া আসিতেই হইবে। অবশ্য যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে বাধ্য করে আমার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করার, যাহা প্রমাণহীন ও জ্ঞানহীনতার কথা, তবে তাহাদের কথা মানিবে না। হাঁ দুনিয়াতে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি বজায় রাখিবে। (আখেরাতের ব্যাপারে) আমার প্রতি ধাবমান লোকেরই অনুসরণ করিবে। (দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী) অতপর তোমাদিগকে আমার প্রতি ফিরিয়া আসিতেই হইবে; তখন আমি তোমাদের কার্যকলাপের হিসাব দেখাইব এবং কর্মফল প্রদান করিব।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ـ

(২) হে বৎস! মানুষের সমুদয় কার্যাবলীই আল্লাহ তাআলা জ্ঞাত থাকেন, এমনকি মানুষের কোন খাছলাত যদি সরিষা পরিমাণ সূক্ষ্মও হয় এবং উহা কোন পাথরের (তথা কোন Strong Room-এর) ভিতর প্রকাশ পায়, কিম্বা সপ্ত আকাশের কোন নিভৃত কোণে বা ভূগর্ভের অন্ধকারে প্রকাশ পায় (আল্লাহর নিকট উহারও হিসাব থাকিবে, কেয়ামতের দিন হিসাবের সময়) তিনি উহা উপস্থিত করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্ম জ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞ।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ

(৩) হে বৎস! নামাযকে পূর্ণাঙ্গ অতি উত্তমরূপে আদায় ও প্রতিষ্ঠিত করিবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করিবে এবং (এই পথে) যত রকমের বিপদাপদ তোমার উপর আসে উহার উপর ধৈর্যধারণ করিবে; নিশ্চয় ইহা হইতেছে প্রকৃত সাহসিকতার কাজ।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ـ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

(৪-৫) গর্ব ও অহঙ্কারে মাতিয়া লোকদের হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিবে না এবং যমিনের উপর দাপট ও দর্পের সহিত চলিবে না; (এইসব অহঙ্কারের নিশান)। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোন অহঙ্কারী গর্বকারীকেই পছন্দ করেন না– আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ـ

(৬-৭) আর পথ চলাকালে (বাচালতার পরিচায়ক ছুটাছুটি বা গর্ব ও অহঙ্কারের পরিচায়ক ক্ষীণ গতির) মধ্যবর্তী চলন অবলম্বন করিবে এবং কথা বলাকালে কোমল স্বরে কথা বলিবে; (চেঁচাইবে না) নিশ্চয়ই গাধার আওয়াজ সর্বাধিক ঘৃণিত আওয়াজ। (যেহেতু গাধা চেঁচাইয়া আওয়াজ করে।)

(সূরা লোকমান ঃ পারা–২১. রুকু– ১১)

উক্ত আয়াতে জানা গেল, মহাজ্ঞানী লেকমান হাকীমের সুচিন্তিত অভিমত ছিল যে, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে শরীক করা অতি বড় মহাপাপ ও অন্যায়। হযরত রসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার এক উক্তিতে লোকমান হাকীমের সেই অভিমতের প্রতি ছাহাবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। হাদীছটি এই–

عن عبد الله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ "اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ" شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيُّنَا لَايَظْلِمُ نَفْسَهٗ فَقَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ اَلَمْ يَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يَابُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন কোরআনের আয়াত এই মর্মে নাজিল হইল যে, "যাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে এইরূপে যে, ঈমানকে অন্যায়ের সঙ্গে মিশ্রিত করে নাই, একমাত্র তাহারাই (দোযখ হইতে) মুক্তি পাইবে।"

তখন ছাহাবীগণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন; (এই ভাবিয়া যে, উক্ত আয়াতের মর্মে কোন ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর যে কোন অন্যায় তথা গোনাহ করিলে সে দোযখ হইতে মুক্তি পাইবে না। কারণ, তাহা আয়াতে বলা হইয়াছে যে, অন্যায়ের সংমিশ্রণ পরিহারকারীদের মধ্যে মুক্তি সীমাবদ্ধ। এই ভীতির দরুন) তাঁহারা হযরতের দরবারে আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, অন্যায় করিয়া নিজের ক্ষতি না করে? (সম্পূর্ণরূপে অন্যায় হইতে আমাদের কেহই বাঁচিয়া থাকে না, সুতরাং উক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী আমাদের কেহই মুক্তি পাইবে না)।

হযরত (সঃ) তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, অন্যায়ের অর্থ যাহা তোমরা বুঝিয়াছ (যে, সব রকমের অন্যায় ত্রুটি– গোনাহ্ তাহা নহে। উক্ত আয়াতে "অন্যায়" অর্থ একমাত্র শের্ক। (অতএব উক্ত আয়াতের মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করিয়া শেরেকী কার্য করতঃ ঈমানের সঙ্গে শেরেককে মিশ্রিত করে সে মুক্তি পাইবে না)।

তোমরা কি লোকমানের উক্তি (পবিত্র কোরআন মারফত) শুন নাই। তিনি স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দান পূর্বক বলিয়াছিলেন, "হে বৎস! তুমি আল্লাহর সঙ্গে শরীক ঠাওরাইও না, নিশ্চয় শেরেক হইতেছে মহা অন্যায়।"

ব্যাখা ঃ শেরেকী গোনাহ আল্লাহ মাফ করিবেন না বলিয়া পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে। শেরেক ভিন্ন অন্য গোনাহ নেক কাজের অছিলায় বা তওবার দ্বারা মাফ হইবে; এ সম্পর্কে কোরআনের আয়াত এই– اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

'নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ তাঁহার সঙ্গে শরীক করার গোনাহ মাফ করিবেন না, উহা ছাড়া অন্য গোনাহ যাহার জন্য আল্লাহ ইচ্ছা করিবেন মাফ করিবেন।"

আলোচ্য হাদীছখানার অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রথম খণ্ডে ২৮ নম্বরে হইয়াছে

হযরত যাকারিয়া (আঃ)

যাকারিয়া (আঃ) ঈসা আলাইহিস সালামের সংলগ্ন যমানারই ছিলেন; হযরত ঈসার মাতা "মারইয়াম"কে যাকারিয়া (আঃ)-ই প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি মারইয়ামের খালু হইতেন, বাইতুল-মোকাদ্দাছের ধর্মীয় প্রধানও তিনিই ছিলেন।

হযরত যাকারিয়ার পিতার নাম সম্পর্কে এত মতভেদ রহিয়াছে যে, কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা

কঠিন। অবশ্যই ইহা সর্বস্বীকৃত যে, তিনি বনী-ইস্রাঈলদের মধ্যে হযরত দাউদ আলাইহিচ্ছালামের বংশধর ছিলেন। যাকারিয়া (আঃ) ছুতার বা মিস্ত্রি কার্য করিয়া নিজ হস্তোপার্জিত আয়ে জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

প্রথম জীবনে হযরত যাকারিয়া নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি এবং স্ত্রী উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সন্তান হয় নাই। সন্তান লাভের আকাঙ্খায় তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি মারইয়ামকে লালন-পালন করিতেন, তিনি তাঁহাকে এক বিশেষ এবাদৎ ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত যাকারিয়া যখনই মারইয়ামের নিকট আসিতেন তখনই তাঁহার নিকট তাজা তাজা ফল-ফলাদির সমাবেশ দেখিতেন। যেই মৌসুমে যে ফল পাওয়া যায় না সেই মৌসুমে সেই ফলই তাজা, টাটকা ও সদ্য আহরিত তাঁহার নিকট দেখিতে পাইতেন।

হযরত যাকারিয়া নিজে এবং তাঁহার স্ত্রী উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে সাধারণ নিয়ম দৃষ্টে সন্তান লাভের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। মারইয়ামের নিকট অমৌসুমী ফল-ফলাদির সমাবেশ দেখিয়া হযরত যাকারিয়ার অন্তরে নতুন আশার সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, মারইয়ামের জন্য আল্লাহ তা'আলা মৌসুমবিহীন ফল-ফলাদির সমাবেশ করিয়া যেরূপ সর্বশক্তির বিকাশ সাধন করিয়াছেন তদ্রূপ আমাকেও বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দান করিতে পারেন। নূতন আশায় মাতিয়া হযরত যাকারিয়া নব উদ্যমে সন্তান লাভের দোয়ায় মনোনিবেশ করিলেন।

একদা তিনি স্বীয় বিশেষ এবাদত-ঘরে নামাযে মশগুল ছিলেন, হঠাৎ একদল ফেরেশতা আসিয়া তাঁহাকে পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দান করিলেন। সুসংবাদ শ্রবণে তিনি বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার স্ত্রী আরও অধিক বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। অবশেষে হযরত যাকারিয়া আল্লাহ তা'আলার এই বিশেষ নেয়ামত সন্তান হওয়ার আলামত ও নিদর্শন দৃষ্টে তিন দিনের জন্য দুনিয়ার সকল প্রকার সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একমাত্র আল্লাহ তা'আলার এবাদতে ব্রতী হইলেন।

কাহারও প্রতি কোন সময় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কোন নেয়ামত আসিলে সে ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশেষ অনুরক্তি প্রকাশ করা এবং তাঁহার এবাদত-বন্দেগীতে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করাই হইল আসল কর্তব্য। হযরত যাকারিয়া (আঃ) সেই আদর্শই স্থাপন করিয়াছেন। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۔

স্মরণ কর, যাকারিয়া নবীর ঘটনা– যখন তিনি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট নিবেদন করিলেন, হে প্রভু! আমাকে উত্তরাধিকারবিহীন নিঃসন্তান রাখিও না, অবশ্য তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। (কিন্তু বাহ্যিক উত্তরাধিকারী সন্তানের অভিপ্রায়ও স্বাভাবিক।) আমি তাঁহার আবেদন পূর্ণ করিলাম এবং দান করিলাম তাঁহাকে "ইহাহ্ইয়া" নামক পুত্র সন্তান তাঁহার আকাঙ্খা পূরণে তাঁহার (বৃদ্ধা) স্ত্রীকে সন্তানোপযোগী করিয়া দিলাম। তাঁহারা সকলেই নেক কার্যে দ্রুতগামী ছিলেন এবং ভয় ও আশার মধ্যে আমার এবাদত-গুজারী করিতেন এবং আমার সম্মুখে সর্বদা নত থাকিতেন। (সূরা আম্বিয়া, পারা–১৭, রুকু–৬)

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۔ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۔ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۔

মারইয়ামকে প্রতিপালনকালে যখনই যাকারিয়া মারইয়ামের নিকট তাহার কক্ষে যাইতেন তখনই তাহার নিকট (অমৌসুমী) ফল-ফলাদির সমাবেশ দেখিতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মারইয়াম! এইসব

তোমার জন্য কোথা হইতে আসে? মারইয়াম বলিলেন, এইসব আল্লাহর তরফ হইতে। নিশ্চয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন বে-হিসাব রিযিক দান করেন। هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

এই ক্ষেত্রে যাকারিয়া স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট আবেদনে বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার! (বাহ্যিক দৃষ্টিতে আশা নাই) আপনি নিজ রহমত ভান্ডার হইতে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করুন। আপনিত দোয়া শ্রবণকারী।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فِى الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِّكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ سَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ -

অতপর তিনি এবাদত-ঘরে নামাজে দাঁড়াইলে একদল ফেরেশতা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ পাঠাইয়াছেন ইয়াহ্ইয়া নামক পুত্রের; যিনি আল্লাহর বিশেষ আদেশবলে জন্মলাভকারী অন্য এক নবীর (তথা ঈসা নবীর) সত্যতার সাক্ষ্য বহন করিবেন, নেতৃত্ব লাভ করিবেন, বিশেষ সংযমী হইবেন এবং বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে গণ্য হইয়া নবুওয়ত প্রাপ্ত হইবেন।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ -

তখন যাকারিয়া বলিলেন, হে প্রভু! আমার পুত্র কিরূপে হইবে অথচ আমি বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছিয়াছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা?

قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ - قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً - قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا - وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ -

আল্লাহ বলিলেন, তোমরা যে অবস্থায় আছ সে অবস্থায়ই তোমরা পুত্র লাভ করিবে; আল্লাহ তা'আলা করিতে পারেন যাহা তিনি ইচ্ছা করেন। যাকারিয়া (আঃ) বলিলেন, পরওয়ারদেগার! ঐ নেয়ামত লাভ নিকটবর্তী হওয়ার কোন নিদর্শন আমাকে জানাইয়া দেন; (যেন বেশী শুকর-গুজারী করার সুযোগ পাই)। আল্লাহ বলিলেন, তোমার জন্য নিদর্শন এই হইবে যে, লোকদের সঙ্গে তোমার কথা বলার শক্তি তিন দিন বন্ধ থাকিবে, শুধু কেবল ইশারা দ্বারা বুঝাইতে পারিবে। এই সময় তুমি তোমার প্রভুর যিকেরে মশগুল হইবে এবং সকাল-বিকাল সর্বদা তাঁহার তছবীহ– পবিত্রতার গুণ জপায় মশগুল থাকিবে। (পারা–৩, রুকু–১২)

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا - اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَاءً خَفِيًّا - قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا - وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا -

পরওয়ারদেগার তাঁহার বিশিষ্ট বান্দা যাকারিয়াকে বিশেষ করুণা ও রহমত দান করিয়াছিলেন– সেই আলোচনা। যখন যাকারিয়া স্বীয় পরওয়ারদেগারের দরবারে চুপে চুপে আবেদন জানাইলেন, প্রভু হে! (বার্ধক্যে) আমার অস্থি পর্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত মাথায় সাদার আবরণ আসিয়া গিয়াছে। আর আমি কোন সময় তোমার নিকট দোয়া করিয়া অকৃতকার্য থাকি নাই।

وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَاءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ - وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا -

আমার মৃত্যুর পরে আমার পরিজন সম্পর্কে আশঙ্কা হয়, (তাহারা দ্বীন হেফাযতে কোরবানী দিবে না।

অবশ্য আশা করি আমার ঔরসের সন্তান সেইরূপ হইবে না।) কিন্তু আমার স্ত্রী বন্ধ্যা (স্বাভাবিক স্তরে তাহার সন্তান হইবে না;) অতএব আপনার নিকট হইতে (অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত) একজন উত্তরাধিকারী আমাকে দান করুন– যে আমার এবং ইয়াকুব-বংশের জ্ঞান-বিদ্যা ও বিশেষত্বের উত্তরাধিকারী হইতে পারে। এবং প্রভূ হে! আপনি তাহাকে নিজ সন্তুষ্টি ভাজনরূপে গড়িবেন।

يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ نِ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ـ

(আল্লাহ বলিলেন,) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ দান করিতেছি একটি বিশেষ পুত্র সন্তানের, যাহার নাম "ইয়াহ্ইয়া" হইবে; (বিশেষ বিশেষ গুণে) যাহার তুলনা আর হয় নাই।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ـ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ـ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ـ

যাকারিয়া আরজ করিলেন, প্রভু হে! কিরূপে আমার ছেলে হইবে, আমার স্ত্রী ত বন্ধ্যা এবং আমিও বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছি? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, উভয়ে এইরূপ থাকাবস্থায়ই সন্তান হইবে। পরওয়ারদেগার আরও বলিলেন, ইহা আমার জন্য সহজ; (লক্ষ্য কর না যে,) আমি ইতিপূর্বে তোমাকে পয়দা করিয়াছি, অথচ তোমার কোন অস্তিত্বই ছিল না। যাকারিয়া বলিলেন, প্রভু হে! (এত বড় নেয়ামতটি আগমনের একটা নিদর্শন) আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দিন। আল্লাহ বলিলেন, তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন লোকদের সঙ্গে কথা বলিতে সক্ষম হইবে না, অথচ তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিবে।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ـ

সে মতে একদা তিনি স্বীয় এবাদত ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং (তখন তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া সুসংবাদ বাস্তবায়িত হওয়া আসন্ন প্রতিপন্ন হইয়াছে। সে মতে) সকলকে ইশারা দ্বারা বলিলেন, তোমরা সকলে (শুকরগুজারি স্বরূপ) সকাল-বিকাল তছবীহ পড়। সূরা মারইয়াম ঃ পারা–১৬, রুকু–৪)

হযরত ইয়াহ্য়্যা (আঃ)

৯৮ বৎসর বয়সের বৃদ্ধা বন্ধ্যা মাতা এবং ১২০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ পিতার ঔরসে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কুদরতে হযরত ইয়াহ্য়্যা জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। ইয়াহ্য়্যা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) উভয়ে একই যমানায় ছিলেন। এমনকি কাহারও মতে ত উভয়ের মাতৃগর্ভে স্থান লাভের সময়ও একই ছিল এবং কাহারও মতে মাত্র ছয় মাসের ব্যবধান ছিল। তাঁহাদের বয়সের ব্যবাধানও ঐ ছয় মাসই ছিল, সর্বোচ্চ সংখ্যার অভিমতেও বয়সের ব্যবধান মাত্র তিন বছরের ছিল।

মেরাজ শরীফে রসুলুল্লাহ (সঃ) তৃতীয় আসমানে হযরত ইয়াহ্য়্যা ও হযরত ঈসার সাক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা তথায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) কর্তৃক পরিচয় করাইবার পর হযরত (সঃ) তাঁহাদের উভয়কে ছালাম করিলে তাঁহারা সাদর সম্ভাষণে উত্তর দিলেন مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح "মারহাবা– ধন্যবাদ উচ্চ মর্যাদাবান ভ্রাতা ও উচ্চ মর্যাদাবান নবীর প্রতি।"

উল্লিখিত মেরাজের হাদীছে হযরত ইয়াহ্য়্যা ও ঈসা সম্পর্কে একটি মন্তব্য করা হইয়াছে যে, هما ابنا خالة তাঁহারা উভয়ে খালাত ভাই ছিলেন। ইহার দুই রকম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে– কেউ কেউ বলিয়াছেন, হযরত ঈসার নানী "হান্নাহ্"র দুই কন্যা ছিল– "মরয়্যাম" ও "য়্যাশা"। য়্যাশার গর্ভে হযরত ইয়াহ্য়্যা এবং মারয়্যামের গর্ভে হযরত ঈসা জন্ম লাভ করেন, সুতরাং ইয়াহ্য়্যা ও ঈসা সাধারণরূপেই পরস্পর খালাত ভাই

হইলেন। কিন্তু অধিকাংশ মোহাদ্দেছ এবং ঐতিহাসিকের মতে হযরত ঈসার নানী "হান্নাহ" সারা জীবন নিঃসন্তান থাকার পর বহু দোয়া-কালামের অছিলায় তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে একমাত্র কন্যা "মারইয়াম" দান করিয়াছিলেন, তাঁহার অপর কোন সন্তানই ছিল না। অবশ্য হযরত ইয়াহ্য়্যার মাতা "য়্যাশা" হযরত ঈসার নানী হান্নাহ্‌র ভগ্নি ছিলেন শুধু এই সূত্রেই উভয়কে খালাত ভাইরূপে ব্যক্ত করা করা হইয়াছে।

হযরত ইয়াহ্য়্যার গুণাবলী সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ একটি হইল- مصدقا بكلمة من الله অর্থাৎ তিনি আল্লাহর কলেমার সত্যবাদিতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতা হইবেন। এস্থলে "আল্লাহর কলেমা।" দ্বারা কেউ তৌরাত কেতাব উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করিয়াছেন- অর্থাৎ তিনি তৌরাত কেতাব অবলম্বী নবী হইবেন; তাঁহার নিকট কোন বিশেষ কেতাব আসিবে না।

কিন্তু সাধারণতঃ পবিত্র কোরআনের ভাষায় كلمة الله কালেমাতুল্লাহ- আল্লাহর কলেমা বলিয়া হযরত ঈসা (আঃ) কে উদ্দেশ্য করা হয়। এই সূত্রে অধিকাংশ তফছীরকারগণ ঐকমত্য এই যে, এস্থলেও হযরত ঈসা-ই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হযরত ঈসার সত্যবাদিতা প্রচার করা হযরত ইয়াহ্য়্যার একটি বিশেষ কার্য হইবে। হযরত ইয়াহ্য়্যা এই দায়িত্বকে সারা জীবন সুচারুরূপে পালন করিয়া গিয়াছেন। এমনকি পিতৃস্পর্শ ব্যতিরেকে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে যখন হযরত ঈসা স্বীয় মাতার গর্ভে জন্ম লাভ করিলেন এবং সকলেই মারইয়্যামের প্রতি তিরস্কার আরম্ভ করিল, তখন হযরত যাকারিয়া ছয় মাসের বা তিন বৎসরের বালক হযরত ইয়াহ্য়্যাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনও শিশু ইয়াহ্য়্যা আল্লাহর কুদরতে প্রদত্ত বাকশক্তি বলে হযরত ঈসার নবুয়তের এবং সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

হযরত ঈসার আবির্ভাবের পর ইহুদিরা তাঁহার প্রাণঘাতী শত্রু হইল। তাঁহার এবং তাঁহার মাতা সম্পর্কে কুৎসিত অপবাদ রটাইয়া তাঁহার নবুয়ত অস্বীকার করাই নয় শুধু, বরং সর্বপ্রকারের বিরোধিতা করিতে লাগিল।

ইহুদিগণের এই বিরোধিতার বন্যার সম্মুখে হযরত ইয়াহ্য়্যা (আঃ) সর্বদা হযরত ঈসার সত্যবাদিতাই প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন, এমনকি অবশেষে, হযরত ঈসার ভ-পৃষ্ঠে অবস্থানকালেই হযরত ইয়াহ্য়্যা স্বীয় দায়িত্ব পালনে জীবন বিসর্জন দিয়া ইহুদিদের হস্তে শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন। হযরত ইয়াহ্য়্যার আরও গুণাবলী উল্লেখ করতঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন-

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۔ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۔ وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا ۢبِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۔ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۔

আর আমি ইয়াহ্য়াকে বাল্যকাল হইতেই দ্বীনের খাঁটি জ্ঞান এবং আমার তরফ হইতে বিশেষরূপে হৃদয়ের কোমলতা ও নম্রতা এবং চরিত্রের পবিত্রতা দান করিয়াছিলাম। তিনি অতি পরহেজগার এবং পিতা মাতার ভক্ত ও ফরমাবরদার ছিলেন, আত্মম্ভরী গোঁড়া নাফরমান প্রকৃতির ছিলেন না।

তাঁহার প্রতি সালাম তথা শান্তির সুসংবাদ জন্মের দিন হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এবং যে দিন পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবেন সেই দিনের জন্যও রহিল। (ছুরা মারইয়্যাম ঃ পারা- ১৩, রুকু-৪)

উল্লিখিত আয়াতে হযরত ইয়াহ্য়্যাকে বাল্যকাল হইতেই দ্বীনের খাঁটি জ্ঞান প্রদত্ত হওয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতের তাৎপর্যে কোন কোন মোফাস্‌সির বলিয়াছেন, বাল্যকালেই হযরত ইয়াহ্য়্যাকে আনুষ্ঠানিকরূপে নবুয়ত দান করা হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ মোফাসসির ও আলেমগণের মত ইহাই যে, নবুয়ত পাইয়াছিলেন পূর্ণ বয়সের সময়ই, অবশ্যই তিনি বিশেষ জ্ঞান ও প্রতিভা অলৌকিকরূপে বাল্যকার হইতেই পাইয়াছিলেন।

হযরত ইয়াহ্ইয়্যা সম্পর্কে তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা এবং তাঁহার আত্মার পবিত্রতা ও পরহেজগারীর উল্লেখ করিয়া আলোচ্য আয়াতে যে প্রশংসা করা হইয়াছে হযরত ইয়াহ্য়্যার জীবন-ইতিহাসও উহার সাক্ষ্য দেয়।

ইবনে আছাকের নামক ইতিহাসবিশারদ ওয়াহ্াব ইবনে মোনাব্বেহ্-এর মাধ্যমে কতিপয় বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত আছে, হযরত ইয়াহ্ইয়্যার উপর আল্লাহ তা'আলার ভয়-ভক্তির এত অধিক প্রভাব ছিল যে, আল্লাহর হুজুরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চেহারার উপর অশ্রু বর্ষণের রেখা পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি সাধারণতঃ বেহাল-বেক্বরার অবস্থায় বন-জঙ্গলেই ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং রোদন-ক্রন্দনের মধ্যেই সময় কাটাইতেন। একদা তাঁহার পিতা যাকারিয়া (আঃ) তাঁহাকে নিবিড় জঙ্গলে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং ঐরূপ রোদন ক্রন্দন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "আমরা তোমার তালাশে ব্যতিব্যস্ত আর তুমি এই নীরব জঙ্গলে বসিয়া কাঁদিতেছে?" হযরত ইয়াহ্ইয়্যা বলিলেন, আব্বাজান! আপনি ত বলিয়াছেন, জাহান্নামকে এড়াইয়া বেহেশতে পৌঁছিতে একটি বিশাল ময়দান অতিক্রম করিতে হয়, সেই ময়দান একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভক্তির অশ্রু বর্ষণেই পার হওয়া সম্ভব হইবে; অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিস্থল বেহেশতে পৌঁছা যাইবে না। এতদশ্রবণে পিতা হযরত যাকারিয়াও কাঁদিয়া উঠিলেন। (কাছাছোল কোরআন-১-২৯৬)

হযরত ঈসা (আঃ)

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পূর্ববর্তী নবীগণের সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মাত্র ছয় শতাব্দীর ব্যবধান ছিল।

হযরত ঈসা (আঃ) ঘর-সংসার জুড়েন নাই, তাঁহার কোন নির্দিষ্ট বাড়ী-ঘর ছিল না তিনি বনী-ইস্রাঈলদের আবাসভূমি ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার বস্তি-বস্তি, শহর-শহর ঘুরিয়া আল্লাহর দ্বীন প্রচার করিয়া থাকিতেন।

হযরত ঈসা (আঃ) বনী-ইস্রাঈল বংশীয় ছিলেন; তিনি আল্লাহর কুদরতে পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে স্বীয় মাতা মারইয়্যামের গর্ভে জন্ম নিয়াছিলেন (বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে)। সুতরাং তাঁহার বংশ তাঁহার মাতা সূত্রেই হইবে।

হযরত মারইয়্যামের পিতার নাম "এমরান", মাতার নাম "হান্নাহ"। তাঁহারা ইভয়েই বনী-ইস্রাঈল বংশীয় নেককার পরহেজগার ছিলেন। "এমরান"-এর পূর্বপুরুষদের নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে, কিন্তু ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, "এমরান" বনী-ইস্রাঈল জাতীয় হযরত ছোলায়মান পয়গাম্বরের বংশধর ছিলেন, আর তাঁহার স্ত্রী "হান্নাহ" দাউদ আলাইহিচ্ছালামের অন্য পুত্রের বংশধর ছিলেন।

হযরত ঈসার আবির্ভাবের পূর্বে বনী-ইস্রায়ীলগণ "ইয়্যাহুদ" (এক বচন "ইয়্যাহুদী") নামে পরিচিত হইত। এই নামের তাৎপর্য সম্পর্কে তিনটি মতামত দেখা যায়। কাহারও মতে বনী-ইস্রায়ীলদের মূল ও আদি পিতা হযরত ইয়াকুবের বড় ছেলের নাম ছিল "ইহুদা" সেই নাম হইতেই "ইয়্যাহুদ" বা "ইয়্যাহুদী" আখ্যার উৎপত্তি। কাহারও মতে উক্ত আখ্যাটি ه و د হা, ওয়া, দাল এই তিন অক্ষর যুক্ত আরবী শব্দ হইতে গৃহীত, যাহার ধাতুগত অর্থ তওবা ও পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা। এই ধাতু হইতে বিশেষ্য পদ হইল "হায়েদ"- هائد যাহার বহুবচন হইল هود কোরআন শরীফেও কোন কোন স্থানে ইহুদিগণকে "হুদ هود শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে, যেমন- وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا "ইহুদিগণ বলে, একমাত্র ইহুদিগণ ব্যতীত আর কেহই বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" আরও আছে- وقالوا كونوا هودا "ইহুদিগণ মুসলমানগণকে বলে, তোমরা ইয়্যাহুদী হইয়া যাও, তবেই সঠিক পথের পথিক হইবে।" এই ধাতু হইতেই ইয়্যাহুদ বা ইয়্যাহুদী শব্দও গৃহীত। যাহার তাৎপর্য এই যে, হযরত মূসার আমলে বনী-ইস্রায়ীলগণ গো-শাবক

বা বাছুর পূজায় লিপ্ত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অতপর হযরত মুছার চেষ্টায় তাহারা তওবা করতঃ হক্ক ও সত্যের প্রতি পুনঃ প্রত্যাবর্তন পূর্বক আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরাধনা করিয়াছিল। পবিত্র কোরআনেও উহার উল্লেখ আছে- انا هدينا اليك " হে মা'বুদ! আমরা তোমার দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিয়াছি (তুমি আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া লও)।" ইহা হইতেই "হুদ; ইয়্যাহুদী" আখ্যার উৎপত্তি। সে মতে ইহুদী আখ্যা মূসার আমল হইতে আরম্ভ বলিতে হইবে; সাধারণতঃ তাহাই প্রচলিত।

হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের আবির্ভাবের পর যাহারা তাঁহার পায়রবী করিল তাহারা নাছারা (একবচনে নাছরানী) নামে আখ্যায়িত হইল; যাহার তাৎপর্য সম্পর্কেও বিভিন্ন মতামত আছে। সাধারণতঃ বলা হয় যে, ঈসা (আঃ) বিরুদ্ধবাদী ও শত্রুদের শত্রুতায় অতীষ্ঠ হইয়া আহবান জানাইয়াছিলেন- যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে এইরূপ আছে من انصارى الى الله "কে আছে যে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী হয়?" তখন কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়া বলিয়াছিল, نحن انصار الله "আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী হইয়া নিজদিগকে উৎসর্গ করিলাম।" نصر -নাছর ধাতুর অর্থ সাহায্য করা, এই ধাতু হইতেই ঈসার অনুগামীগণ নাছারা বা নাছরানী নামের আখ্যা লাভ করে।

সারকথা, হযরত ঈসার আমলে বনী-ইস্রাঈলগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল, এক দল হযরত ঈসার বিরুদ্ধবাদী শত্রু; তাহারা ইয়্যাহুদ নামেই রহিল, আর এক দল ঈসা আলাইহিচ্ছালামের অনুগামী ও সাহায্যকারী তাহারা "নাছারা" নামে পরিচিত হইল।

ইহুদিগণ ত প্রথম হইতেই হযরত ঈসার ঘোর বিরোধী ও শত্রু ছিল, এমনকি হযরত ঈসার সমর্থনের কারণেই তাহারা হযরত ইয়াহ্য়্যাকে শহীদ করিয়াছিল এবং হযরত ঈসাকেও প্রাণে বধ করার পরিকল্পনা করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাহারা হযরত ঈসার নবুয়তকেই শুধু অস্বীকার করিয়াছিল না, বরং তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসিত অপবাদও রটাইয়াছিল। তিনি যে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে পুরুষের স্পর্শ ছাড়া মারইয়্যামের গর্ভে জন্ম নিয়াছিলেন- ইহার সুযোগে (নাউজুবিল্লাহ) তাঁহার প্রতি জারজ হওয়ার অপবাদ প্রচার করিয়াছিল।

অপরদিকে নাছারাগণ হযরত ঈসার বর্তমানকাল পর্যন্ত ত সঠিক পথেই থাকে, তাঁহার তিরোধানের পর তাহারা নানারকমে পথভ্রষ্ট হয়। বিশেষতঃ তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত এবং কতিপয় মো'জেযাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাকে খোদার বেটা বলে। কেহ কেহ তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতাকে তিন খোদার দুই খোদা বলে।

এতদ্দৃষ্টে পবিত্র কোরআন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত মর্যাদা সঠিকরূপে স্থির করতঃ বিভিন্ন যুক্তি তর্কে ও দলিল প্রমাণের মাধ্যমে ইহুদ-নাছারা উভয় দলের অপবাদ ও অতিরঞ্জনের প্রতিবাদ করিয়াছে। এমনকি হযরত ঈসার মাতা মারইয়্যামের জন্ম বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্ত ও তাঁহার বিশিষ্ট মো'জেযা সমূহের বিবরণ, ইহুদিদের অপবাদের উত্তর দান এবং নাছারাদের অতিরঞ্জনের খন্ডনে কোরআন বহু বিবৃতি দিয়াছে। নিম্নে পবিত্র কোরআনের ঐসব বিবৃতিরই ধারাবাহিক উদ্ধৃতি প্রদান করা হইবে।

মারইয়্যামের জন্ম বৃত্তান্ত

মারইয়্যামের পিতার নাম ছিল "এমরান" এই "এমরান" হযরত মূসার পিতা "এমরান" নহে; হযরত মূসার পিতা এমরানের যুগ এই এমরানের যুগের বহু পূর্বে। তদ্রূপ পবিত্র কোরআনে ১৬ পারায় ছুরা মারয়্যামের এক আয়াতে মারয়্যামকে ياخت هارون হে হারুনের ভগ্নি" বলা হইয়াছে; এই "হারুন" হযরত মুছার ভ্রাতা পয়গাম্বর হযরত হারুন নহেন, বরং হযরত হারুনের বহু পরের হারুন নামীয় অন্য এক ব্যক্তিকে উক্ত আয়াতে মরয়্যামের ভ্রাতা বলা হইয়াছে।

প্রায় সমস্ত তফছীরকারগণের বিবরণেরই দেখা যায় যে, মারইয়্যামের মাতা "হান্নাহ্" বন্ধ্যা ছিলেন। এক মাত্র আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত বলে তাঁহার গর্ভে মারইয়্যাম জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, আর কোন

সন্তানই তাঁহার জন্মে নাই। অধিকাংশ তফসীরকারগণের মত এই যে, এমরানের অন্য স্ত্রীর পক্ষে এক ছেলে ছিল; তাহারই নাম ছিল "হারুন"। সে ছিল অতি মহৎ ও সৎ; মারইয়্যাম তাঁহার বৈপিতৃক ভগ্নি ছিলেন, সেই সুত্রেই মারইয়্যামকে "হারুনের ভগ্নি" বলা হইয়াছে।

এমরান বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছিয়াছিলেন, "হান্নাহ" বাঁঝা নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে সন্তানের লালসা অত্যধিক ছিল। কথিত আছে- একদা "হান্নাহ্ নিজ ঘরের বারান্দায় পায়চারী করিতেছিলেন। নিকটবর্তী একটি বৃক্ষের উপর একটি পাখী তাহার বাচ্চাকে আদর ভরা মুখে আহার দিতেছিল এবং বাচ্চার প্রতি অন্তর ভরা স্নেহ-মমতা দেখাইতেছিল। সন্তান লালায়িত হান্নাহ্ ঐ দৃশ্য দেখিয়া আবেগপূর্ণ অন্তরে আল্লাহর দরবারে সন্তানের দোয়া করিলেন। তাঁহার দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হইয়া গেল। অনতিবিলম্বেই তিনি গর্ভবতী হইলেন। স্বামীও বৃদ্ধ নিজেও বৃদ্ধা এবং বাঁঝা; এমতাবস্থায় স্বীয় গর্ভে সন্তান জন্মিবার আভাস অনুভব করিয়া হান্নার অন্তর আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

সেই যুগে রীতি ছিল, দ্বীনদার লোকেরা নিজেদের দুই-এক সন্তান আল্লাহর ঘর বাইতুল-মোকাদ্দাছের খেদমতের জন্য অন্য সম্পর্ক হইতে মুক্ত করিয়া দিত এবং এই কাজের জন্য ছেলে সন্তানই উপযুক্ত বলিয়া মেয়ে সন্তান এইরূপে মুক্ত করার প্রথা ছিল না। হান্নাহ স্বীয় অন্তরে পুত্র সন্তান লাভের আশা পোষণপূর্বক আল্লাহর দরবারে মান্নত করিলেন, " যে সন্তান লাভের আশা পোষণপূর্বক " হে আল্লাহ! আমার গর্ভে যে সন্তান জন্ম নিবে সে তোমার জন্য মুক্ত হইবে- তোমার ঘরের খেদমতের জন্য তাহাকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিব বলিয়া আমি মান্নত- অঙ্গীকার করিতেছি।"

অতপর সন্তান জন্মের পূর্বেই এমরানের মৃত্যু হইয়া গেল। তারপর বিধবা হান্নাহ যখন সন্তান প্রসব করিল তখন উহাকে মেয়ে সন্তান দেখিতে পাইয়া তাঁহার সমস্ত আশা আকাঙ্খার উপর পানি পড়িয়া গেল। কারণ, মেয়ে সন্তান বাইতুল-মোকাদ্দাছের খেদমত কি করিতে পারিবে? এই জন্যই সাধারণতঃ ঐ কাজে ছেলে সন্তানকেই মনোনীত করা হইত এবং গ্রহণ করা হইত। এইসব ভাবনায় হান্নার ভাঙ্গা বুক হইতে আক্ষেপের শব্দ বাহির হইল- তিনি প্রভুর দরবারে করুণ স্বরে বলিলেন, "প্রভু হে! আমি ত মেয়ে সন্তান প্রসব করিয়াছি।"

আদি-অন্তের সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত ছিলেন যে, এই মেয়ে সন্তানটি কত বড় মর্যাদাশালিনী হইবে এবং তাহার মাধ্যমে এক বিশেষ কুদরত বিকশিত হইবে। তাহার ঔরষে হযরত ঈসার ন্যায় পয়গম্বর জন্ম লাভ করিবেন- এই সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা জ্ঞাত ছিলেন। এইসব দৃষ্টে ইহা বাস্তব কথা যে, বহু পুত্র সন্তান এই মেয়ের মর্যাদার কাছেও ভিড়িতে পারে না।

বিধবা হান্নাহ নিজেই মেয়েটির নাম রাখিলেন "মারইয়্যাম", যাহার অর্থ "আল্লাহর এবাদত বন্দেগীতে আত্মনিয়োগকারিণী।" অতপর অল্প দিনের মধ্যেই মারইয়্যাম একটু জ্ঞান বুদ্ধির বয়সে পৌঁছিলে পর হান্নাহ স্বীয় মান্নত পূর্ণ করার জন্য মেয়েকে বাইতুল-মোকাদ্দাছের খাদেম বা পুরোহিতগণের হাওয়ালা করার উদ্দেশ্যে লইয়া গেলেন। মেয়ে সন্তানকে এই কার্যে গ্রহণ করা সাধারণ রীতি ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে এবং তাঁহাদের দলীয় বিশেষ পুরোহিত ও সুপ্রসিদ্ধ বুজর্গ বিশেষতঃ তাঁহাদের ইমাম এমরানের মেয়ে হিসাবে তাঁহারা মারইয়্যাকে শুধু গ্রহণই করিলেন না, বরং তাঁহার লালন-পালন সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মস্ত বড় প্রতিযোগিতা হইল। এমনকি এক বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরোহিত প্রধান সেই যমানার পয়গাম্বর হযরত যাকারিয়া (আঃ) মারয়্যামের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিলেন, তিনি মারয়্যামের খালুও হইতেন।

হযরত যাকারিয়া তাঁহার বিশেষ তত্ত্বাবধানে মারয়্যামের লালন-পালন করিতে লাগিলেন এবং তথায় শৈশবকাল হইতেই মারয়্যামের অলৌকিক ঘটনাবলীর বিকাশ আরম্ভ হইল। মারয়্যামের জন্ম বৃত্তান্ত পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ-

اِذْ قَالَتِ امْرَاَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– এমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল, হে পরওয়ারদেগার! আমার গর্ভে যে সন্তান জন্ম লাভ করিবে আমি তাহাকে তোমার জন্য মুক্ত করিয়া দিব। তুমি আমার এই মান্নত কবুল কর; তুমি ত সব কিছুই শুন এবং জান।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى ـ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ـ

অতপর যখন সে সন্তান প্রসব করিল, (এবং উহা মেয়ে হইল) তখন সে অপেক্ষা করিয়া বলিল, পরওয়ারদেগার! আমি ত মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়াছি। (সে ঐ মেয়ের মর্যাদা অজ্ঞাত; তাই তাঁহার আক্ষেপ;) আল্লাহ ভালরূপেই জ্ঞাত ছিলেন সে কি প্রসব করিয়াছে। এবং বস্তুতঃ (সাধারণ) পুত্র সন্তান ঐ মেয়ের তুলনায় কিছুই নহে।

وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ

(এমরানের স্ত্রী বলিল,) আমি এই মেয়ের নাম "মারয়্যাম" রাখিলাম। আর হে প্রভু! আমি ইহাকে এবং ইহার সন্তান-সন্ততিকে শয়তান মরদুদ হইতে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে প্রদান করিলাম।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ـ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ـ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ـ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

পরওয়ারদেগার ঐ মেয়েকেই (বাইতুল মোকাদ্দাছের খেদমতের জন্য) সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করিলেন এবং সুন্দররূপে তাহাকে গড়িয়া তুলিলেন। তাহাকে (তৎকালীণ পয়গাম্বর) যাকারিয়া লালন-পালনে রাখিলেন। যাকারিয়া যখনই মারয়্যামের কক্ষে যাইতেন তাহার নিকট খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত পাইতেন। যাকারিয়া বলিলেন, হে মারইয়্যাম! এই খাদ্য সামগ্রী তোমার জন্য কোথা হইতে আসে? মারয়্যাম বলিল, ইহা আল্লাহর গায়বী-খাজানা হইতে আসে; নিশ্চয় আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন বে-হিসাব রিযিক দান করিয়া থাকেন। (পারা–৩, রুকু–১২)

হযরত যাকারিয়া তত্ত্বাবধানে যাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা

পূর্বেই বলা হইয়াছে মারয়্যামের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানে রাখা সম্পর্কে বাইতুল মোকাদ্দাছের পুরোহিতগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইল– তাঁহারা প্রত্যেকেই মারয়্যামকে নেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অবশেষে স্থির করা হইল যে, পুরোহিতগণ সকলেই নিজ নিজ কলম (যাহা দ্বারা তাঁহারা তৌরাত শরীফ লিখিয়া থাকিতেন) প্রবাহমান পানিতে ফেলিবেন। যাহার কলম স্রোতের বিপরীত চলিবে তিনিই মারয়্যামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন। তাহাই করা হইল এবং সকলের মধ্যে একমাত্র যাকারিয়ার কলমই আল্লাহর বিশেষ কুদরতে স্রোতের বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল; ফলে তিনিই মারয়্যামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত

হইলেন।* পবিত্র কোরআনেও এই ঘটনার ইঙ্গিত রহিয়াছে–

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلاَمَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ـ

(আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ (সঃ) আপনি যে, মারয়্যামের বৃত্তান্ত সঠিকরূপে লোকদিগকে শুনসাইলেন ইহা আপনার অহী-বাহক নবী হওয়ার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ,) যখন মারইয়্যামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে পুরোহিতগণ নিজ নিজ কলম (পানিতে) ফেলিতেছিল, তখন আপনি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না, ঐ ব্যাপারে যখন তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল তখনও আপনি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না। (পারা–৩, রুকু–১৩)

মারইয়্যামের উচ্চ মর্যাদা

হযরত যাকারিয়া (আঃ) মারয়্যামের জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাছ মসজিদ সংলগ্নে বিশেষ কক্ষ তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় মারইয়্যাম আল্লাহ তায়ালার এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকিত এবং নির্ধারিত সময়ে বায়তুল-মোকাদ্দাছ মসজিদের খেদমত করিত।

এবাদত বন্দেগী, পারছায়ী-সতিত্ব ইত্যাদি সৌভাগ্যের চরিত্রে মারইয়্যাম অপরিসীম যশ লাভ করিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালাও প্রকাশ্যে তাহার মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাহার জন্য গায়েব হইতে মৌসুমবিহীন ফল-ফলাদি ও খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত হইয়া থাকিত। সময় সময় ফেরেশতা তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ্যে বিভিন্ন সুসংবাদ শুনাইয়া থাকিতেন, যাহার বর্ণনা পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে–

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعَالَمِيْنَ ـ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ .....

"এই ঘটনা স্মরণ কর, যখ ফেরেশতাদের একটি দল মারয়্যামকে এই বলিয়া সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন যে, হে মারয়্যাম! নিশ্চিতরূপে জানিইয়া লও, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বিশিষ্ট মকবুল বান্দা বানাইয়াছেন এবং তোমাকে (অসন্তুষ্টিকর কার্যাবলী হইতে) পাক-পবিত্র থাকার ছাঁচে গঠিত করিয়াছেন। আর তোমার বৈশিষ্ট্য এই যুগের বিশ্ববাপী নারী সমাজের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। হে মারয়্যাম! তুমি (এই মান-মর্যাদার শুকরিয়া স্বরূপ) চিরজীবন সর্বদা স্বীয় পরওয়ারদেগারের আনুগত্যে ও দাসত্বে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাক এবং (সেই আনুগত্যের ও দাসত্বাবলম্বনের প্রকাশ্য নিদর্শন স্বরূপ) অন্যান্য নামাযীদের ন্যায় রুকু-সেজদার আদর্শগত নামাযের পাবন্দ থাক। (পারা–৩, রুকু–১৩)

১৬৫১। হাদীছ ঃ قَالَ عَلِىٌّ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ ـ

অর্থ ঃ আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, হযরত নবী ছাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমরানের কন্যা মারয়্যাম তাঁহার যুগের সর্বোত্তম নারী ছিলেন এবং এই যুগের সর্বোত্তম নারী ছিলেন খাদীজা।

ব্যাখ্যা ঃ কোন মানুষের নিজ আমল যদি তাহাকে অগ্রাধিকারী করে তবে অন্য কোন কিছুই তাহাকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে না; ইহার প্রকৃষ্ট নমুনা ছিলেন মারইয়্যাম। লোকেরা তাঁহার সম্পর্কে কত অপবাদ রটাইয়াছিল, বাহ্যিক অবস্থায় মারইয়্যামের নিকটও অপবাদের কোন উত্তর ছিল না, কিন্তু তাঁহার সতিত্ব, পবিত্রতা ও খোদা-ভক্ততা তাঁহাকে এরূপ উচ্চাসনের অধিকারী করিয়াছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র

* এই ঘটনা কাহারও মতে মারয়্যামের প্রাথমিক শৈশবকাল অতিক্রম করিয়া একটু বুঝদার হওয়ার পর ঘটিয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশের মত এই যে, শৈশবের প্রারম্ভেই মারয়্যাম হযরত যাকারিয়া হস্তে গিয়াছিল।

কোরআনে সারা বিশ্বের মোমেনদের জন্য তাঁহাকে নমুনা স্বরূপ পেশ করিয়াছেন এবং উল্লিখিত হাদীছেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য রহিয়াছে।

মারয়্যামের গর্ভবতী হওয়ার বৃত্তান্ত

মারইয়্যাম যখন ১৩ বা ১৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন (তফছীর রুহুল মায়ানী ১৬-৭৯) তখন একদা তিনি স্বীয় আবাসিক কক্ষ হইতে বাহিরে পূর্ব দিকে নিজ সংশ্রবীয়লোকদেরও নজরের আড়ালে পূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা করিয়া একাকী নির্জনে গোসল করিতেছিলেন। হঠাৎ ফেরেশতা জিব্রাঈল একজন সুষ্ঠু সুশ্রী মানুষের বেশ-ভুষায় মারইয়্যামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মারইয়্যাম তাঁহাকে একজন বেগানা পুরুষ ভাবিয়া আতঙ্কিত হইয়া আল্লাহ তা'আলার ভয়ের দোহাই দিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন। তখন জিব্রাঈল (আঃ) স্বীয় সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানে বলিলেন যে, আমি তোমারই পরওয়ারদেগারের প্রেরিত দূত। উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বিশেষ আদেশ বলে সৃষ্ট এক মহান সন্তান তোমাকে দান করিবেন– যিনি বনী ইস্রাঈলদের জন্য রসূল হইবেন এবং বহু রকমের মোযেজা দ্বারা তাঁহার প্রকাশিত হইবে। সেই মহান সন্তানেরই সুসংবাদ আল্লাহর তরফ হইতে তোমার নিকট নিয়া আসিয়াছি এবং তোমাকে সেই সন্তান অর্পণ করিতে আসিয়াছি।

মারইয়্যাম স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, বৈধ-অবৈধ কোন প্রকারেই (সন্তান জন্মানোর সাধারণ ব্যবস্থা–) পুরুষের স্পর্শ আমার উপর হয় নাই। এমতাবস্থায় আমার ছেলে হইবে কিরূপে? জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা এই সন্তানকে সৃষ্টি করিবেন সাধারণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই; ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

জিব্রাঈলের উক্তি বাস্তবের অনুকূলই ছিল, কারণ মূল সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনি ত সাধারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বা সাধারণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সব রকমেরই সৃষ্টি করিতে সক্ষম, নতুবা তিনি সৃষ্টিকর্তাই নহেন। যে শুধু গঠনকারী হয় সে অবশ্য উপাদানের প্রত্যাশী হয়, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা কোন কিছুর প্রত্যাশী নহেন, সৃষ্টিকর্তা ত কোন মূল, সত্ত্বা ও উপাদান ব্যতিরেকেই অস্তিত্ব দান করিতে পারেন, সৃষ্টির অর্থই ইহা।

এইসব কথোপকথনের পর জিব্রায়ীল ফেরেশতা মারইয়্যামের বক্ষ বরাবর ফুঁৎকার মারিলেন।* বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে, সঙ্গে সঙ্গে মারয়্যাম গর্ভধারণ অনুভব করিলেন। অতপর কাহারও মতে অনতিবিলম্বেই প্রসবাবস্থারও সম্মুখীন হইলেন, কিন্তু অধিকাংশের মত ইহাই যে, সাধারণ রীতি অনুসারে দীর্ঘ দিন তথা ৯ বা ৮ মাস গর্ভকাল অতিবাহিত হওয়ার পরই প্রসব হইয়াছিল।

(তফসীর রুহুল মায়া'নী ১৬-৭৯)

---

*যেই ফুৎকার দ্বারা হযরত ঈসার রুহ বা আত্মা মারয়্যামের গর্ভে পৌছিয়াছিল প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ফুৎকার আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের বিকাশ ছিল মাত্র। ঐ স্থলে জিব্রায়ীল ফেরেশতা শুধু কেবল সেই কুদরতের বাহক এবং সেই কুদরত বিকাশের মাধ্যম ছিলেন। জিব্রাঈল ফেরেশতার আর কোন কৃতিত্ব তথায় ছিল না, সব কিছুর কর্মকর্তা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাই ছিলেন।

পবিত্র কোরআন পারা–২৮, সূরা তাহরীমের সমাপ্তিতে স্পষ্টরূপে এই বিষয়টির ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এই আয়াতে হযরত ঈসার রুহ বা আত্মাকে মরয়্যামের গর্ভে পৌছাইবার ক্রিয়াপদের কর্মকর্তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজকেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا .

"আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের জন্য এমরানের কন্যা মারয়্যামের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন– মারইয়্যাম তাহার পাক পবিত্রতাকে পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল, আমি তাহার বক্ষে আমার সৃষ্ট রুহ ফুকিয়া দিয়াছিলাম।"

এইরূপ বিবরণের আরও একটি দৃষ্টান্ত কোরআন শরীফেই বর্ণিত আছে, কোন কোন জেহাদে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে; হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) ধুলা-বালুর মুষ্ঠি শত্রু সেনাদের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার সেই একমুষ্ঠি ধুলা-বালুর অংশ শত শত শত্রু-সেনার প্রত্যেকের চোখেই পতিত হইয়াছে– সেই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন।

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

"আপনি যখন ধুলা মুষ্ঠি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তখন নিক্ষেপকারী আপনি ছিলেন না– প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তায়ালাই নিক্ষেপকারী ছিলেন।"

মারইয়্যাম স্বীয় বৃত্তান্ত হযরত যাকারিয়ার স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই তিনি মুরুব্বির পক্ষ হইতে কোন বিপদের সম্মুখীন হইলেন না। কারণ, তাঁহারা ত পূর্ব হইতে মারইয়্যামের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাই বিনা দ্বিধায় তাঁহারা এই ঘটনাকে বাস্তবরূপে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সাধাণ্যে যখন তাঁহার গর্ভাবস্থা প্রকাশ পাইল তখন লোকদের সন্দেহ ও আনাগোনার সূত্রপাত হইল। স্থান বিশেষে মারইয়্যাম যুক্তি তর্কের কাটা-কাটিও করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ তফছীর ইবনে কাছীর তৃতীয় খন্ড ১১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে- বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদেরই আ একজন খাদেম ছিলেন তাহার নাম ছিল "ইউসুফ নাজ্জার" তিনি মারইয়্যামের আত্মীয়ও ছিলেন। মারয়্যামের যখন গর্ভ প্রকাশ পাইয়া উঠিল, তখন ইউসুফের মনে ভয়ানক সংশয়ের সৃষ্টি হইল। কারণ, একদিকে অবিবাহিতা নারীর গর্ভধারণ; অপরদিকে মারইয়্যামের পাক-পবিত্রতা, দ্বীনদারী, এবাদতগুজারী ইত্যাদি যাহা বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদের প্রত্যেক খাদেমই ভালরূপ অবগত ছিলেন। ভয়ানক সংশয় ও সমস্যার মধ্যে একদা ইউসুফ মারয়্যামকে বলিলেন, হে মারয়্যাম আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব; উহার উত্তর দানে তাড়াহুড়া না করিয়া বিশেষ চিন্তা-বুদ্ধির দ্বারা উত্তর দিবেন। মারইয়্যাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই কথাটি কি? ইউসুফ নাজ্জার বলিলেন,

هل يكون قط شجر من غير حب وهل يكون زرع من غير بذر وهل يكون ولد من غير اب ـ

"দানা ব্যতিরেকে, বৃক্ষ, বীজ ব্যতিরেকে ফসল জন্মিতে পারে কি? পিতা ব্যতিরেকে পুত্র হইতে পারে কি?" মারইয়্যাম তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া উত্তর দানে বলিলেন,

اما قولك هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر فان الله قد خلق الشجر والزرع اول ما خلقهما من غير حب ولابذر ـ وهل يكون ولد من غير اب فان الله تعالى قدخلق ادم من غير اب ولا ام ـ

"আপনার প্রশ্ন- দানা ব্যতিরেকে বৃক্ষ এবং বীজ ব্যতিরেকে ফসল জন্মিতে পারে কি? আমি বলি, আল্লাহর কুদরতে তাহা নিশ্চয়ই হইতে পারে; আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম বৃক্ষ ও ফসলের গাছ দানা ও বীজ ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আপনার প্রশ্ন, পিতা ব্যতিরেকে পুত্র হইতে পারে কি? ইহাও নিশ্চয়ই হইতে পারেই; আল্লাহ আদমকে পিতা-মাতা ব্যতিরেকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" فصدقها وسلم لها حالها

"ইউসুফ নাজ্জার মারয়্যামের উত্তরে পূর্ণ সন্তুষ্ট ও আস্থাবান হইলেন এবং তাঁহার সমুদয় বৃত্তান্ত মনে প্রাণে গ্রহণ করিলেন।"

মারইয়ামের উক্ত যুক্তি ও দৃষ্টান্ত, পবিত্র কোরআনেও বর্ণিত আছে-

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ـ

"নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ, ঈসার জন্ম লাভের (সাধারণ নীতিবিহীন) ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার কুদরতের কারখানায় তদ্রূপই ছিল যেরূপ আদমের জন্ম লাভের ব্যাপার। আদমকে (সাধারণ নীতি ব্যতিরেকেই) আল্লাহ তায়ালা মাটি দ্বারা তৈরী করিয়াছিলেন; অতপর "কুন্" হইয়া যাও" বলার সঙ্গে সঙ্গে (জীবন্ত মানুষ) হইয়া গিয়াছিল। ইহা একটি বাস্তব সত্য যাহা তোমার পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে প্রচারিত; এই সম্পর্কে কোন প্রকার সংশয় আনিও না। (পারা-৩, রুকু-১৪)

এইরূপে স্থান বিশেষে ত মারইয়্যাম সংশয় দূর করার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সর্বসাধারণের মুখ বন্ধ করা ত সহজ নহে, সুতরাং এই সংবাদ যতই ছড়াইতে লাগিল ততই লোকদের অপবাদ মারয়্যামের প্রতি বাড়িতে লাগিল। মারয়্যাম লোকদের অপবাদে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। এদিকে প্রসবের সময় নিকটবর্তী হইল, তাই তিনি লোকদের হইতে দূরে সরিয়া নির্জনে যাওয়ার মানসে পার্বত্য এলাকায় চলিয়া গেলেন। বাইতুল মোকাদ্দাছ মসজিদ হইতে ৮ মাইল দূরে বাইতুল-লাহ্‌ম (বেথেলহাম) নামক স্থানে পৌঁছিলে প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। তিনি একটি খেজুর গাছের নিকটে উহাতে হেলান দিয়া বসিলেন এবং সব একিন-বিশ্বাসের সহিত উপলব্ধি করা সত্ত্বেও মানুষের অপবাদ স্মরণ পূর্বক এবং এইরূপ কঠিন সময়ে নিঃসম্বল নিঃসহায়তা দৃষ্টে অনুতপ্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমনকি, তিনি আল্লাহর দরবারে কামনা করিলেন যে, এই অবস্থার পূর্বেই আমার মৃত্যু হইয়া আমি ভূ-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেলে আমার জন্য ভাল হইত।

এই সময় দূরে ও আড়ালে থাকিয়া ফেরেশতা জিব্রিল মারয়্যামকে সান্ত্বনা দিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত বলে তথায় তাঁহার পানাহারের যে ব্যবস্থা হইয়াছে উহার খোঁজ বাতাইয়া দিলেন যে, তোমার অদূরেই তোমার প্রভু নির্মল ঠান্ডা পানির নালা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। আর তোমার হেলান দেওয়ার খেজুর গাছটিতে এখনই খেজুর পয়দা করিয়া দিয়াছেন, উহাকে একটু নাড়া দিলেই পাকা পাকা খেজুর তোমার সম্মুখে পড়িবে, তুমি ইচ্ছা করিলেই তাজা তাজা সুস্বাদু খেজুর খাইতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে লোকদের দ্বারা বিব্রত ও বিরক্ত না হইয়া পারা যায়– তাহার পরামর্শও মারয়্যামকে দিলেন। সেকালে রোযার নিয়ম এই ছিল যে, রোযাদার ব্যক্তি কথা বলিতে পারিবে না, তাই মারয়্যামকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, এই ঘটনা সম্পর্কে লোকদের পক্ষ হইতে তোমার উপর যতই প্রশ্ন আসুক না কেন তুমি সকলকে ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাইয়া দিবে যে, তুমি রোযা থাকার নিয়ত ও মান্নত করিয়াছ।

অতপর মারইয়্যাম শিশুকে কোলে লইয়া প্রকাশ্যে নিজের লোকদের মধ্যে আসিয়া গেলেন। অপবাদ, তান-তিসনা ও তিরস্কারের ঝড় বহিতে লাগিল। মারইয়্যাম রোযার দরুন কথা বলা হইতে বিরত থাকিলেন এবং শিশুর প্রতি ইশারা করিয়া তাহার নিকট হাল-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, লোকগণ ইহাতে আরও বিরক্তি প্রকাশ করিল, কিন্তু সদ্য প্রসূত শিশু হযরত ঈসা স্বীয় বৈশিষ্ট্যের বিবৃতি দান করিলেন এবং তিনি যে নবী হইবেন, আল্লাহ তায়ালার কেতাব প্রাপ্ত হইবেন সে সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন; যদ্বারা মারইয়্যামের প্রতি সকল অপবাদের অবসান হইয়া গেল। এই বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কোরআনের বিবৃতিতে লক্ষ্য করুন–

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔

একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন ফেরেশতাগণ মারইয়্যামকে বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন তাঁহার তরফ হইতে প্রদত্ত কলেমার (দ্বারা সৃষ্ট সন্তানের) যাহার নাম হইবে "মছীহ-মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা"। সে হইবে অতি মর্যাদাশালী দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। এবং সে হইবে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের একজন। আর সে নবজাত শিশু অবস্থায় এবং প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় (সমভাবে পূর্ণ) কথা বলিবে এবং সে বিশিষ্ট লোকদের একজন হইবে।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ۔ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۔ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۔

মারইয়্যাম (বুঝিতে পারিলেন, এইসব পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতেই, অতএব তাঁহার প্রতিই রুজু হইলেন–) আরজ করিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার সন্তান কিরূপে হইবে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই? (ফেরেশতা) বলিলেন, এইরূপেই আল্লাহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন যাহা ইচ্ছা করেন, (আল্লাহ নিজ কুদরত বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করেন।) যখন তিনি কোন বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা করেন তখন উহা সম্পর্কে হওয়ার আদেশ করেন; তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়। (পারা–৩, রুকু–১৩)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ـ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ـ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ـ

কোরআনের মাধ্যমে মারইয়্যামের ঘটনা উল্লেখ করুন যখন মারইয়্যাম (গোসলের জন্য) স্বীয় পরিজন হইতে পৃথক হইয়া পূর্ব এলাকার এক স্থানে আসিল এবং পর্দা করিয়া তাহাদের দৃষ্টি ও নজরের আড়াল হইয়া গেল।

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ـ قَالَتْ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ـ

এমতাবস্থায় আমি তাহার নিকট আমার দূত জিব্রাঈলকে পাঠাইলাম। সে তাহার সম্মুখে পূর্ণ মানুষের বেশ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। মারইয়্যাম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি দয়াময়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি তোমা হইতে; তোমার যদি খোদার ভয় থাকে তবে ইহার মর্যাদা রক্ষা কর।

قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ـ

জিব্রাঈল বলিলেন, আমি আপনার প্রভুর দূত; একটি পবিত্র ছেলে আপনাকে অর্পণ করার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ـ قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ـ وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ـ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ـ فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ـ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ـ فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ـ وَهُزِّىْ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ـ

মারইয়্যাম বলিল, আমার ছেলে হইবে কিরূপে, অথচ কোন মানুষ আমাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করে নাই, আর আমি বদকার মোটেও নই? জিব্রায়ীল বলিলেন, এই অবস্থায়ই (পুত্র হইবে;) আপনার পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন, এই অবস্থাতেই সন্তান দেওয়া আমার জন্য সহজ। (এই পুত্রকে এইভাবে সৃষ্টি করায় অন্যান্য অনেক রহস্য ত আছেই) এবং এই উদ্দেশ্যও রহিয়াছে যে, আমি তাহাকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে আমার বিশেষ কুদরতের নিদর্শন বানাইতে চাই এবং (তাহাকে নবুয়ত দানে লোকদের জন্য) আমার তরফ হইতে রহমত বানাইতে চাই। আর এইরূপে তাহার জন্ম নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। সেমতে মারইয়্যাম গর্ভে ছেলে ধারণ করিল। তারপর গর্ভ লইয়া সে এক দূরের এলাকায় চলিয়া গেল। অতপর প্রসব-বেদনা তাহাকে একটি খেজুর গাছের নিকট নিয়া আসিল। মারইয়্যাম অনুতাপ করিয়া বলিল, এই ঘটনার পূর্বে মরিয়া যাওয়া এবং নাম-নেশানা মুছিয়া যাওয়াই আমার পক্ষে উত্তম ছিল। তখন মারইয়্যামের অবস্থান স্থলের পাদদেশ হইতে জিব্রাঈল ডাকিয়া বলিলেন, আপনি ঘাবরাইবেন না। আপনার প্রভু (আপনার পানাহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন–) আপনার সন্নিকটে একটি নালা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, আর খেজুর আপনার উপর ঝরিয়া পড়িবে।

فَكُلِى وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ـ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِىْ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ـ

অতএব আপনি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করুন এবং (মহান পুত্র দর্শনে) চোখ ঠান্ডা করুন। অতপর যদি আপনি কোন মানুষকে দেখেন, (এ সম্পর্কে কিছু বলিতে চায়) তবে (ইশারায়) বলিয়া দিবেন, আমি দয়াময় আল্লাহর নামে রোযার মান্নত ও নিয়্যত করিয়াছি, আজ কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলিবই না।

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ـ يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ـ

অতপর মারইয়্যাম ছেলেকে কোলে উঠাইয়া স্বীয় লোকজনের মধ্যে আসিয়া গেল। সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, হে মারইয়্যাম! তুমি বড় জঘন্য কাজ করিয়াছ! হে হারুনের ভগ্নী! তোমার পিতা কোন খারাপ লোক ছিলেন না এবং তোমার মাতাও বদকার ছিলেন না, (তুমি এরূপ হইলে কিরূপে?)

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ـ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ـ

মারয়্যাম (প্রতি উত্তর না কিরিয়া) ছেলের দিকে ইশারা করিল; (তোমাদের যাহা বলিতে হয় ছেলের সঙ্গে বল।) লোকজন বলিল, কোলের শিশুর সঙ্গে আমরা কথা বলিব কিরূপে?

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ـ وَجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ـ

ঐ শিশু বলিয়া উঠিলেন, আমি আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা। তিনি আমাকে কেতাব দিবেন এবং নবী বানাইবেন এবং তিনি আমাকে লোকদের কল্যাণ ও মঙ্গলকামী বানাইয়াছেন, আমি যেখানেই থাকি লোকদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিব। আর আমাকে নামায ও যাকাতের কঠোর আদেশ করিয়াছেন– যাবত আমি (শরীয়তের স্থান ইহজগতে) জীবিত থাকি।

وَبَرًّا بِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ـ وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ـ

এতদ্ভিন্ন আমার মাতার ফরমাবরদারী করারও আদেশ করিয়াছেন, আর আল্লাহ আমাকে রূঢ়, বদমেজাজী, বদনছীবরূপে সৃষ্টি করেন নাই। আর আমার প্রতি সালাম– (শান্তির প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে সর্বদার জন্য, বিশেষতঃ) জন্মের দিন, মৃত্যুর দিন এবং পুনরুত্থানের দিন। (সূরা মারইয়্যাম– পারা–১৬, রুকু–৫)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আসমানী কেতাবে অন্যান্য মৌলিক বিষয়াবলীর সঙ্গে নবীগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণও থাকে। বিশ্ব-মানবের পক্ষে শিক্ষণীয় ঘটনাবলী এবং কোন নবীর প্রতি ভ্রষ্ট লোকদের কোন অপবাদ থাকিলে খন্ডন ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয়বস্তু সাধারণতঃ নবীগণের ইতিহাস বর্ণনায় গ্রহণ করা হয়। পবিত্র কোরআনেও সাধারণ নবীগণের এই ধরনের আলোচনাই রহিয়াছে।

হযরত ঈসা (আঃ) সাধারণ রীতি বিহীন– কোন পুরুষের মাধ্যম ব্যতিরেকে স্বীয় মাতার গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন যাহা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরত ছিল, কিন্তু এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রষ্ট ইহুদিরা হযরত ঈসা এবং তাঁহার মাতা পাক-পবিত্র মারইয়্যামের প্রতি অপবাদ ও কুৎসার ঝড় বহাইয়া দিয়াছিল।

ভ্রষ্ট ইহুদিদের অপবাদের প্রতিবাদেই পবিত্র কোরআন হযরত ঈসার উচ্চ মর্যাদার বিবরণে এবং তাঁহার মাতার পবিত্রতা ও উচ্চ মর্তবার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানে অনেক বিবৃতি দিয়াছে। যদ্বারা অবোধ নাছারা খৃস্টানরা সরল প্রাণ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে যে, মুসলমানদের কোরআনেই হযরত ঈসার এত অধিক প্রশংসা বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে ঐরূপ বর্ণনা নাই, অধিকন্তু হযরত ঈসার মাতা মার্ইয়্যামেরও বহু বহু প্রশংসা কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে।

অবোধরা এতটুকু উপলব্ধি করিল না যে, হযরত ঈসা ও তাঁহার মাতা মারইয়্যামের এইরূপ প্রশংসা প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, ভ্রষ্ট ইহুদিরা হযরত ঈসা ও তাঁহার মাতার উপর জঘন্য অপবাদের কালিমা লেপন করিয়াছিল; উহারই সাফাই প্রদানে পবিত্র কোরআন এত অধিক তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে। ইহা বিশ্ব-হেদায়েত নামা পবিত্র কোরআনের বড় দায়িত্ব ছিল। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁহার মাতা সম্পর্কে ঐরূপ সাফাই প্রদানের কোন রূপ প্রয়োজনই দেখা দেয় নাই।

হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁহার মাতা মারইয়্যাম সম্পর্কে দুই দল দুই পথে গোমরাহ হইয়াছে। ইহুদিরা গোমরা হইয়াছে তাঁহাদের প্রতি অপবাদ ও জঘন্য তোহমত লাগাইয়া, আর নাছারারা পরবর্তীকালে গোমরাহ হইয়াছে তাঁহাদের সম্পর্কে অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন করিয়া। হযরত ঈসা (আঃ) নবী ও রসূল ছিলেন, কিন্তু ছিলেন তিনি আল্লাহর বান্দী মারইয়্যমের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী মানুষ। তদ্রূপ মারইয়্যাম পাক-পবিত্র, আল্লাহ তায়ালার নিকট বিশেষ মর্যাদাবান ছিলেন, কিন্তু ছিলেন তিনি আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্ট বান্দা। নাছারাগণ পরবর্তীকালে এক ইহুদি মোনাফেকের ধোকায় পড়িয়া মরয়্যামকেও খোদা এবং হযরত ঈসাকেও খোদা বা খোদার পুত্র বলিয়া বিশ্বাস ও দাবী করে। যাহার ইতিহাস এই–

হযরত ঈসাকে খোদার পুত্র বানাইবার রহস্য

হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁহার প্রচারিত সত্যধর্ম ও সেই ধর্মাবলম্বী নাছারাগণের সঙ্গে ইহুদিদের ঘোর শত্রুতা প্রথম ইহতেই চলিয়া আসিয়াছিল। ইহুদিগণ প্রতমতঃ স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) কে প্রাণে বধ করার চেষ্টা করে, তাঁহার ভূপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করার পর তাঁহার প্রচারিত সত্য দ্বীনকে নষ্ট করিবার তদবীরে তাহারা লাগিয়া যায়। প্রকাশ্য শক্তি ও বল প্রয়োগে তাঁহার দ্বীনকে বিকৃত করিতে না পারিয়া মোনাফেকীর সহিত মিত্রবেশে সেই সত্য দ্বীনকে বিকৃত করতঃ উহাকে মিথ্যারূপে রূপান্তরিত করিতে প্রয়াস পায়। যাহার ঘটনা এই যে, জনৈক ইহুদি মোনাফেকীভাবে স্বীয় ইহুদি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশীরূপে ঈসায়ী বা নাছরানী হয়– খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং সে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল পর্যন্ত জঙ্গলে জঙ্গলে ভন্ড তপস্যা, তপ-জপ, সাধনা–ভজনা করিতে থাকে। অতপর সে হঠাৎ লোকালয়ে ফিরিয়া আসে এবং এই প্রচারণা চালায় যে, আমি স্বয়ং যীশু–খৃস্টের দর্শন লাভ করিয়াছি। তিনি আমাকে বলিয়াছেন– "তুমি লোকদিগকে বলিয়া দাও, লোকেরা যেন আমাকে জারজ সন্তান মনে না করে, আমাকে যেন স্বয়ং খোদার পুত্র গণ্য করে এবং আমি যে, শূলি কাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করিয়াছি উহাকে যেন অপমৃত্যু মনে না করে। আমি জগতে সমস্ত মানুষের– যাহারা আমাকে খোদার বেটা বলিয়া বিশ্বাস করিবে তাহাদের সকলের পাপ মোচনের জন্য শূলি কাষ্ঠের মৃত্যু বরণ করিয়াছি। আমি স্বয়ং খোদার বেটা হইয়া নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়া জগতের সকল মানুষের পাপ পিতার নিকট হইতে মোচন করাইয়া লইয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি আমাকে খোদার বেটা বলিয়া বিশ্বাস করিবে কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

এই প্রবঞ্চক ছদ্মবেশী ইহুদিকেই পরবর্তীকালে প্রবঞ্চিত খৃস্টানগণ " সেন্টপল" নামে অভিহিত করিয়াছে এবং তাহাকে ও তাহার পবঞ্চনাময় মিথ্যা উক্তিকে শুধু গ্রহণই করে নাই, বরং উহাকেই কেন্দ্র করিয়া নিজেদের ধর্মমত গঠন করিয়াছে, আজও খৃস্টানগণ উহারই প্রচার করিয়া থাকে।

ইহুদিরা জানিয়া বুঝিয়া প্রবঞ্চনা করতঃ হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের সত্য দ্বীনকে বিকৃত ও বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে, তাই পবিত্র কোরআন ইহুদিগণকে مغضوب عليهم "মগযুব আলাইহিম" "আল্লাহ তায়ালার ক্রোধানলে পতিত ও অভিশপ্ত" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। আর খৃষ্টানগণ প্রবঞ্চনা ও ধোকায় পতিত হইয়া হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের দ্বীনের নামে মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়াছে এবং সেই মিথ্যাকে চালু রাখিয়াছে, তাই পবিত্র কোরআন তাহাদিগকে ضالين জাল্লীন "পথভ্রষ্ট" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে।

ইসলাম বাস্তববাদী ধর্ম ইহার প্রতিটি আক্বিদা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপবাদ ও অতিরঞ্জনের ঠাঁই ইসলামে নাই। এই দৃষ্টি ভঙ্গিতেই ইসলাম হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কীয় ইহুদী ও নাছারা উভয় দলের ভ্রষ্টতার খন্ডন করিয়াছে।

পবিত্র কোরআন একদিকে ইহুদিদের অপবাদ ও তোহ্মতের বিরুদ্ধে হযরত ঈসা ও মারয্যামের প্রসংশায় বিশেষ প্রচারণা চালাইয়াছে। অপরদিকে হযরত ঈসা ও মারইয়্যাম সম্পর্কে তওহীদের পরিপন্থী ও তওহীদ ধ্বংসকারী নাছারাদের যেসব অবাস্তব, অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন রহিয়াছে পবিত্র কোরআন সে সবের প্রতিবাদেও বিরাট প্রচারণা চালাইয়াছে এবং অনেক অনেক দলিল প্রমাণ ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সে সবের খন্ডন করিয়া নাছারাদের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এইরূপে ইহুদী নাছারা উভয় দলের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার ধুম্রজালকে ছিন্ন করিয়া পবিত্র কোরআন ছেরাতে-মোস্তাক্বীমের বিকাশ সাধন করিয়াছে যে–

(১) হযরত ঈসা আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট পয়গাম্বর ছিলেন, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট বান্দা ছিলেন, মারইয়্যামের পুত্র ছিলেন।

(২) মারইয়্যাম পাক-পবিত্র, খোদাভক্তা নারী ছিলেন, আল্লাহর সৃষ্ট বান্দী ছিলেন।

(৩) যেরূপ সারা বিশ্বের মা'বুদ ও প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালা; তদ্রূপ হযরত ঈসা ও মারয়্যামেরও মা'বুদ প্রভু-পরওয়ারদেগার ও আল্লাহ তায়ালা।

(৪) আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে অন্য কাহাকেও শরিক সাব্যস্ত করা যাইবে না, উহা অতিশয় মহাপাপ– যাহার অবধারিত ফল হইবে চিরকালের জন্য জাহান্নাম।

নাছারাবাদের অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের প্রতিবাদে, উল্লিখিত বাস্তব সত্যসমূহের বিকাশনে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন–

হযরত ঈসা ও মারইয়্যাম উভয়ই আল্লাহর বান্দা ছিলেন

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لاَ تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ ۔ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۔

হে কেতাবধারী নাছারাগণ! ধর্মীয় ব্যাপারে অতুক্তি ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইও না এবং আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তব কথা বলিও না (যে ,তাঁহার ছেলে আছে বা তাঁহার শরিক আছে।) ঈসা মসীহ যিনি মারইয়্যাম পুত্র তিনি আল্লাহর রসূল ছিলেন মাত্র এবং আল্লাহর বিশেষ আদেশে সৃষ্ট ছিলেন, যেই আদেশ আল্লাহ তায়ালা মারইয়্যামের প্রতি পৌঁছাইয়াছিলেন এবং তিনি আল্লাহরই সৃষ্ট একটি আত্মা (তথা আত্মাবিশিষ্ট জীব; তিনি আল্লাহর পুত্র বা আল্লাহর শরীক কস্মিনকালেও নহেন– হইতে পারেন না।)

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلاَ تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۔ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحٰنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً ۔

অতএব সঠিকরূপে আল্লাহর উপর ঈমান আন (যে, তেনি একমাত্র মা'বুদ) এবং আল্লাহর রসূলদের উপর ঈমান আন (যে, তাঁহারা আল্লাহর বান্দা ও প্রতিনিধি।) এইরূপ কথা মুখেও আনিও না যে, খোদা তিনজন; এই ধরনের কথা চিরতরে পরিহার কর; তোমাদেরই মঙ্গল হইবে। বস্তুতঃ খোদা বা মাবুদ একমাত্র আল্লাহ। তিনি এক, তাহার শরিক নাই। তাঁহার সন্তান আছে এইরূপ কথা (নিছক গর্হিত; ইহা) হইতে তিনি পাক-পবিত্র। আসমান সমূহে এবং যমিনে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার মালিকানাভুক্ত; (একটিও তাঁহার সন্তান, সমকক্ষ বা শরীক নহে।) সব কিছু সমাধানে মহান আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ; (অন্যের প্রত্যাশী নহেন।)

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلاَ الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ـ

(তোমরা মছীহকে খোদা বা খোদার পুত্র বল, অথচ) স্বয়ং মছীহ কস্মিনকালেও আল্লাহর বান্দা হওয়ায় নাক সিটকাইবেন না। উচ্চস্তরের ফেরেশতাগণও নাজ সিটকান না যে, তাঁহারা আল্লাহর বান্দা।

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ـ

যে কেউ আল্লাহর বন্দেগী ও গোলামী অবলম্বনে নাক সিটকাইবে এবং অহঙ্কার করিবে সে যেন স্মরণ রাখে, আল্লাহ সকলকে তাঁহার নিকট (হিসাবের জন্য) উপস্থিত করিবেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ ـ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ وَلاَ يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيْرًا ـ

অতপর যাঁহারা প্রমাণিত হইবেন ঈমানদার নেক আমলকারী তাঁহাদিগকে আল্লাহ তাঁহাদের প্রাপ্য প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করিবেন এবং স্বীয় করুণাবলে আরও অধিক দিবেন। পক্ষান্তরে যাহারা অবাধ্য ও অহঙ্কারী প্রমাণিত হইবে, তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি দিবেন। তাহারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন বন্ধু ও সহায়ক পাইবে না। (পারা–৬, রুকু–৩)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ بْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ـ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

ঐ সমস্ত লোক কাফের যাহারা বলে, মারইয়্যাম-পুত্র মছীহ আল্লাহ্ই। (অর্থাৎ আল্লাহ মছীহ-এর রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।* (হে মুহাম্মাদ (সঃ) আপনি এই কথার অসারতা বুঝাইতে তাহাদের বলুন, আচ্ছা বলত মছীহকে এবং তাঁহার মাতা মরয়্যামকে এবং দুনিয়ার সকল মানুষকে আল্লাহ যদি মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা রোধ করার শক্তি কাহারও আছে কি? (সেই শক্তি কাহারও নাই, মছীহ-এরও ছিল না।) অথচ আল্লাহ যিনি হইবেন তাঁহার ক্ষমতায় ও আয়ত্তে হইবে সকল আসমান, যমিন এবং যাহা কিছু এই দুই-এর মধ্যে আছে।

তিনি সৃষ্টি করিতে পারিবেন যাহা ইচ্ছা এবং আল্লাহ হন সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (মসীহ-ঈসার মধ্যে কি এই শ্রেণীর কোন গুণ আছে?) (সূরা মায়েদাঃ পারা– ৬, রুকু– ৭)

* নাসারাদের মধ্যে বহু দল আছে– এক দলের দাবী এই যে, হযরত মছীহ খোদার পুত্র। আর এক দলের দাবী এই যে, তিন খোদার মধ্যে মসীহ ও তাঁহার মাতা মারইয়্যাম হইলেন দুইজন। আর এক দলের দাবী এই যে, মছীহ-ঈসা খোদা অর্থাৎ খোদা মসীহ-এর রূপে ও আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন– ইত্যাদি ইত্যাদি।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۔ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ ۔ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۔

ঐ সমস্ত লোক কাফের যাহারা বলিয়া থাকে যে, মারইয়্যাম পুত্র মসীহ আল্লাহই। অথচ মসীহ বলিয়াছেন, হে বনী ইস্রাঈলগণ! তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু পরওয়ারদেগার। (তিনি আরও বলিয়াছেন) তোমরা স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশতকে চিরদিনের তরে হারাম ও নিষিদ্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহার চিরকালীন বাসস্থান হইবে দোযখ এবং অনাচারীদের সহায়ক কেহই হইবে না। (পারা–৬, রুকু– ১৪)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۔ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۔ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔

তাহারা কাফের যাহারা বলে, আল্লাহ তিন জনের একজন, (অর্থাৎ ঈসা, মারইয়্যাম এবং আল্লাহ এই তিন জন খোদা,) অথচ মাবুদ এক জনই আছেন (তিনি হইলেন, আল্লাহ তায়ালা।) তিনি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই। (খোদা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের) ভ্রষ্ট লোকগণ যদি ঐসব হইতে চিরতরে বিরত না হয় তবে অবশ্যই (আখেরাতের) কষ্টদায়ক আযাব ঐসব কাফেরকে পাকড়াও করিবে।

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ۔ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

(সেই আজাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কুফরী ত্যাগ করতঃ) তাহারা আল্লাহ পানে প্রত্যাবর্তন করে না কেন এবং (পুর্বাবস্থার জন্য) আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় না কেন? অথচ আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাকারী পরম দয়ালু। (পারা– ৬,রুকু– ১৪)

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۔

মারইয়্যাম-পুত্র মসীহ আল্লাহ রসূল– তিনি আর কিছুই নহেন। তাঁহার পূর্বে অনেক রসূলই অতীত হইয়াছেন। (কেহই খোদা বা খোদার বেটা হন নাই।

وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۔ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ۔ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۔

মছীহ-এর মাতা মারইয়্যাম ছিলেন (আল্লাহর প্রভুত্বে) পূর্ণ বিশ্বাসী, সত্যের প্রতীক। (তাঁহাদের কেহ খোদা হইতেই পারেন না। কেননা) তাঁহারা উভয়ে খাদ্য খাইতেন; (তাঁহাদের প্রত্যেকেই জীবন ধারনে আহারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।হে বিশ্বাসী! দেখ– মছীহকে যাহারা খোদারূপে বিশ্বাস করে তাহাদের (সেই ভুল নিরসনের) জন্য কিরূপ স্পষ্ট দলিল ও যুক্তি বর্ণনা করিতেছি; এতদসত্বেও তাহারা কিভাবে উল্টা পথে যাইতেছে তাহাও লক্ষ্য কর।

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۔ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(হে মুহাম্মাদ!) আপনি তাহাদিগকে বলুন, তোমরা কি (বোকা? যে,) এমন বস্তুর এবাদত কর যাহার মোটেই ক্ষমতা নাই তোমাদের লাভ-লোকসান করার? জানিয়া রাখিও, আল্লাহ (তোমাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপ) সব কিছু শুনেন ও জানেন।

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَاتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ـ

আপনি তাহাদিগকে বলুন হে কেতাবধারী নাছারাগণ! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে অবাস্তব অতিরঞ্জনের পথ অবলম্বন করিও না এবং তোমরা তোমাদের ঐসব পূর্ব পুরুষদের অনুসারী হইও না যাহারা পূর্বেই পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং আরও অনেককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে এবং সঠিক পথ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

(পারা- ৬, রুকু- ১৪)

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ـ وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ـ

হযরত ঈসা (ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার মাতার প্রতি অপবাদ খণ্ডনে) বলিলেন, আমি আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা, আল্লাহ আমাকে কেতাব দিবেন এবং নবী বানাইবেন বলিয়া নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমাকে লোকদের মঙ্গলকামী বানাইয়াছেন আর আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ করিয়াছেন যাবত আমি (ভূপৃষ্ঠে) জীবিত থাকি। (ছুরা মারইয়্যামঃ পারা- ১৬, রুকু- ৫)

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ـ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ ـ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

(হযরত ঈসার জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করার পর আল্লাহ বলেন,) মারইয়্যাম-পুত্র ঈসার পরিচয় এই। ইহাই সত্য বিবরণ যাহার মধ্যে ভ্রষ্ট ইহুদি-নাছারাগণ বিভিন্ন মত পোষণ করে। আল্লাহ সম্পর্কে এইরূপ কথা নিছক অবান্তর যে তিনি সন্তান রাখেন; অথচ তিনি মহান, পাক-পবিত্র। (আল্লাহ সকলের সৃষ্টিকর্তা, তাঁহার সৃষ্টি ক্ষমতা এইরূপ যে,) যখন তিনি কোন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার ইচ্ছা করেন, তখন উহা সম্পর্কে শুধু তাঁহার আদেশ হয়- "কুন্" হইয়া যাও; ফলে তৎক্ষণাৎ সেই বস্তু অস্তিত্ববান হইয়া যায়। (ঈসার জন্ম এই ক্ষমতার দ্বারাই।

(পারা-১৬, রুকু- ৫)

আলোচ্য বিষয়ে স্বয়ং ঈসা (আঃ) কর্তৃক চূড়ান্ত বিবৃতি

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সর্ব সমক্ষে বিশেষতঃ ভ্রষ্ট নাছারাদের শুনাইবার জন্য ঈসা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি কি লোকদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহারা যেন আপনাকে এবং আপনার মাতাকে উপাস্য ও মা'বুদ বানায়?

তখন হযরত ঈসা (আঃ) বিশেষ দৃঢ়তা ও যুক্তি-প্রমাণের সহিত উহা অস্বীকার করিবেন। ভ্রষ্ট নাসারাদের অতিরঞ্জিত কথাবার্তা খণ্ডন করতঃ স্পষ্ট দাবী করিবেন যে, আমি তাহাদিগকে একমাত্র এই শিক্ষাই দিয়াছি যে- ان اعبدوا الله ربى وربكم

হে বিশ্ববাসী! তোমরা সকলে এক আল্লাহকে মা'বুদরূপে গ্রহণ কর- এক আল্লাহর বন্দেগী, গোলামী ও এবাদত কর; যিনি আমার ও প্রভু-পরওয়ারদেগার এবং তোমাদেরও প্রভু-পরওয়ারদেগার।

তিনি ইহাও বলিবেন যে, যাবত আমি ভূপৃষ্ঠে ছিলাম তাবৎ লোকদের মধ্যে এই শিক্ষা সম্পর্কে আমি পূর্ণ তদারক এবং পর্যবেক্ষণ করিয়া চলিয়াছি; যে গলদ তাহাদের মধ্যে আসিয়াছে আমার পরে আসিয়াছে। আমি তাহাদের অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের প্রতি অসন্তুষ্ট- উহার সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ নাই।

উক্ত প্রশ্নোত্তরের ঘটনা কেয়ামতের দিন ঘটিবে। আল্লাহ তায়ালা নাছারাবাদের কল্পিত ও গর্হিত অত্যুক্তি খন্ডনের জন্য এবং বিশ্ববাসীকে বুঝাইবার জন্য পবিত্র কোরআনে সেই ঘটনার বর্ণনা দিয়াছেন। যাহার উদ্ধৃতি এই–

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ ۔ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۔ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ۔ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۔ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ۔ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۔ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔

স্মরণ কর (কেয়ামতের দিনের ঘটনা–) যখন আল্লাহ জিজ্ঞাস করিবেন, হে মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা! আপনি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহ ভিন্ন আমাকে এবং আমার মাতাকেও মাবুদরূপে গ্রহণ কর? ঈসা বলিবেন, আপনি মহান, পাক-পবিত্র– যে কথা বলিবার অধিকার আমার নাই সেই কথা বলা আমার পক্ষে শোভা পায় না; আমি উহা বলি নাই। যদি আমি ঐরূপ বলিয়া থাকিতাম তবে আপনি অবশ্যই জ্ঞাত থাকিতেন, আমি আপনার সব বিষয় জানিতে পারি না, কিন্তু আপনি ত আমার অন্তরের অন্তস্থলেরও সব কিছু জ্ঞাত আছেন; আপনি অপ্রকাশ্য সব কিছুও জ্ঞাত থাকেন। আমি তাহাদিগকে এক মাত্র ঐ কথাই বলিয়াছি যাহা আপনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন– তোমরা একমাত্র আল্লাহকে মাবুদরূপে গ্রহণ কর, যিনি আমারও পরওয়ারদেগার এবং তোমাদেরও পরওয়ারদেগার। আর আমি তাহাদের হাল-অবস্থার পর্যবেক্ষক ছিলাম যাবৎ আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থানকারী ছিলাম। অতপর যখন আপনি আমাকে উঠাইয়া নিয়া আসিয়াছেন তখন হইতে একমাত্র আপনিই তাহাদের হাল অবস্থা প্রত্যক্ষকারী ছিলেন; আপনি ত সর্ব বিষয়েরই অবগতি রাখেন। (তাহাদের সব গোমরাহী আপনি জ্ঞাত আছেন– এখন) যদি আপনি তাহাদের শাস্তি দেন তবে সেই ক্ষমতা ও অধিকার আপনার রহিয়াছে। কারণ তাহারা হইল আপনার বান্দা; (আপনি তাহাদের প্রভু।) আর যদি তাহাদেরকে ক্ষমা করেন তবেও (কিছু বলার অধিকার কাহারও নাই কারণ;) আপনি সর্বশক্তিমান সর্বক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বজ্ঞানী হেকমতওয়ালা। (পারা–৭, রুকু– ৬)

১৬৫২। হাদীছ ঃ ওবাদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এইরূপ আকীদা ও বিশ্বাসের ঘোষণা দিবে যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই– মা'বুদ একমাত্র আল্লাহ; তিনি এক, অদ্বিতীয়; তাঁহার কোন শরীক-সাথী নাই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁহার সৃষ্ট বান্দা, তাঁহার প্রেরিত রসূল এবং ঈসা (আঃ) আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা, তাঁহার প্রেরিত রসূল; (সৃষ্টির রীতি পুরুষের স্পর্শে নারী গর্ভে সন্তানের জন্ম– এই রীতি ব্যতিরেকে পুরুষের স্পর্শ বিহীন শুধু) আল্লাহ তাআলার আদেশ বার্তা "কুন– হইয়া যাও" দ্বারা সৃষ্ট, এই আদেশের প্রতিক্রিয়া আল্লাহ তায়ালা মারইয়ামের প্রতি পৌছাইয়াছিলেন এবং (সাধারণ রীতি তথা কোন পুরুষ-স্পর্শনের মাধ্যম ব্যতিরেকে) আল্লাহ তায়ালা সরাসরি একটি রুহ বা আত্মারূপে হযরত ঈসাকে (মাতৃগর্ভে) পৌছাইয়া দিয়াছিলেন, (তিনি আল্লাহর সন্তান বা সমকক্ষ ছিলেন না।)

আরও ঘোষণা দিবে যে, (আল্লাহ-ভক্তদের জন্য) বেহেশত বরহক্ক ও বাস্তব এবং আল্লাহদ্রোহীদের জন্য) দোযখ বরহক্ক ও বাস্তব (–এই সব গল্প-গুজব নহে।)

এইরূপ আক্বিদাহ ও বিশ্বাসের ঘোষণা দানকারী ব্যক্তিগণ বেহেশত লাভ করিতে পারিবে নিজ নিজ আমলের ভিত্তিতে। (এমন কি যদি ঐরূপ ঘোষণা দানকারীর আমল ভাল না হয় এবং স্বীয় বদ আমল আল্লাহর দরবার হইতে ক্ষমা না করাইয়া থাকে তবে শাস্তি ভোগ করার পর উক্ত বিশ্বাস তথা ঈমানের বদৌলতে অবশ্যই চিরস্থায়ী রূপে বেহেশত লাভ করিতে পারিবে।)

নাছারাবাদের তথাকথিত যুক্তি-তর্কের বিষয়বস্তু

ভূমিকা ঃ দুনিয়াতেও দেখা যায়, কোন ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি (EMBASADOR) নিযুক্ত হইয়া আসিলে তিনি স্বীয় নিযুক্তিস্থলে পদার্পণ করিয়া পরিচয়পত্র পেশ করেন। তদ্রূপ রসূলগণ আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি; যত রসূল দুনিয়াতে পদার্পণ করিয়াছেন প্রত্যেকেই আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের সম্মুখে স্বীয় পরিচয়পত্র স্বরূপ বিভিন্ন মোযেজা বা অলৌকিক ঘটনাবলী দেখাইয়াছেন যদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্পর্কে রহিয়াছে, তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে এত বড় ক্ষমতা দান করিয়াছেন।

মো'জেযা যত বড়ই হউক না কেন উহার মূল কর্মকর্তা এবং মূল উৎস হইলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। নবী বা রসূলের সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং যে কোন প্রকার মো'যেজার দরুন যদি নবী বা রসুলকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পর্যায়ে রাখা হয় তবে তাহা গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা হইবে এবং কোন নবী কখনও নিজে ঐরূপে দাবী করিতে পারেন না। শয়তানই লোকদিগকে গোমরাহ করিয়া অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনে পতিত করে।

নবীকে বহু রকমের বহু মো'জেযাই প্রদান করা হয়, অবশ্য সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে, যেই যুগে যেই বিষয়ে লোকদের উন্নতি অধিক ছিল সেই বিষয়েই আল্লাহ তায়ালা সেই যুগের নবীকে তাঁহার প্রধান মোজেযা দান করিয়াছেন। কারণ, সেই বিষয়ে যুগের লোকদের চরম উন্নতি লাভ থাকা সত্ত্বেও যখন নবী অন্য লোকদের ক্ষমতার ঊর্ধের ঘটনা দেখাইতে সক্ষম হন তখন ন্যায়পরায়ণ লোকগণ নবীর মর্যাদাটা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। যেমন মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগে যাদুবিদ্যার অত্যধিক প্রসার ছিল, তদ্দৃষ্টে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে "আ'ছা" বা লাঠিকে সাপ বানাইবার মোজেযা দিয়াছিলেন। যদ্দুরূন শুভবুদ্ধির উদয়নে যাদু-করগণ তৎক্ষণাৎ হযরত মূসার মর্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যুগে এবং তাঁহার জন্মদেশে আরবী সাহিত্যের অত্যধিক উন্নতি ছিল। তদ্দৃষ্টে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে মানব ক্ষমতার ঊর্ধ্বের সাহিত্যিক গুণাবলী বিশিষ্ট কেতাব কোরআন মজিদ প্রধান মো'জেযারূপে দান করিয়াছিলেন।* যদ্দরুন ন্যায়পরায়ণ আরবগণ অতিসহজেই তাঁহার মর্যাদা অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ আরবী কবি "লবীদ" এবং আরও অনেক কবির ঘটনা ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে।

যুগে যুগে নবীগণের মো'জেযা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এই নিয়মই চলিয়া আসিয়াছে যে, যেই যুগে যে বিষয়ের অধিক উন্নতি ও প্রভাব ছিল সেই যুগের নবীকে সেই বিষয়ে প্রধান মোজেযা দেওয়া হইয়াছে– ইহা বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য।

যেই যুগে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব সেই যুগে চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। তদ্দৃষ্টে আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মো'জেযা দিয়াছিলেন যে, তিনি এমন এমন ব্যধি বা রোগকে ভাল করিতে পারিতেন যাহা সকল চিকিৎসকের নিকট দুরারোগ্য। যেমন–

(১) মৃত্যু– ইহার কোন চিকিৎসা চিকিৎসকের নিকট নাই; মরা মানুষকে বেউ জীবিত করিতে পারে না। হযরত ঈসাকে আল্লাহ তায়ালা মো'যেজা দিয়াছিলেন– তিনি কোন মৃতকে লক্ষ্য করিয়া قم باذن الله কুম বে ইজ্ নিল্লাহ "আল্লাহর আদেশে তুমি জীবিত হইয়া যাও" বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মৃতদেহ জীবিত হইয়া উঠিত।

---

* পূর্ববর্তী নবীগণকে যে সব আসমানী কেতাব প্রদান করা হইয়াছিল উহার এবারত (reading) কোরআন মজিদের ন্যায় সাহিত্যিক গুণাবলীতে মানবশক্তির ঊর্ধ্বে ছিল না; যাহার ফলে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, কর্তন ও সংমিশ্রণের দ্বারা ঐ সবের বিকৃতি সাধন সম্ভব হইয়াছে। পক্ষান্তরে লক্ষ লক্ষ শত্রুর সক্রিয় চেষ্টা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ চৌদ্দশত বৎসর কোরআন মজিদের একটি অক্ষরের বেশ-কম করাও সম্ভব হয় নাই, হইবেও না।

(২) মাটির তৈরী পাখির আকৃতি- কোন চিকিৎসাবিদ এইরূপ জড় জিনিসকে আত্মা দান করিয়া জীবন্ত বানাইবে তাহা সম্ভব নহে। আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মোজেযা দিয়াছিলেন- তিনি ঐরূপ মাটির তৈরী পাখীর দেহে ফুৎকার মারিলে আল্লাহ তায়ালার আদেশে উহা বাস্তবেই পাখী হইয়া উড়িয়া যাইত।

(৩) জন্মান্ধকে কোন চিকিৎসক চিকিৎসার দ্বারা তাহার দৃষ্টি শক্তি আনয়ন করিতে পারে না, তদ্রূপ কুষ্ঠ রোগের কোন চিকিৎসা চিকিৎসাশাস্ত্রে নাই। আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মো'জেযা দিয়াছিলেন- তাঁহার অছিলায় আল্লাহ তায়ালা জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করিতেন এবং কুষ্ঠ রোগ দূর হইয়া যাইত।

(৪) এতদ্ভিন্ন হযরত ঈসার এই মো'জেযা এও ছিল যে, বাড়ীতে যে যাহা খাইয়াছে এবং যাহা সঞ্চিত রাখিয়াছে, ঈসা (আঃ) নিজে নিজেই সেই সবের বিবরণ বলিয়া দিতে পারিতেন।

এইসব বিষয়াবলী অলৌকিক ও অসাধারণ ছিল বটে, কিন্তু পয়গাম্বরগণের পক্ষে তাহাদের মো'জেযা স্বরূপ এই ধরনের ঘটনাবলী যুগে যুগেই চলিয়া আসিয়াছে। পবিত্র কোরআনে হযরত মূসার ঘটনা উল্লেখ আছে- এক নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর সন্ধান দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসার জন্য নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আরও একটি ঘটনা উল্লেখ আছে- হযরত মূসা সত্তর জন লোকের একটি প্রতিনিধি দল লইয়া তূর পর্বতে গিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য হঠকারিত করিলে সকলেই আল্লাহর গজবে ধ্বংস হইয়াছিল। অতপর হযরত মূসার দোয়ার বদৌলতে সত্তর জনের সকলেই জীবিত হইয়াছিল। তদ্রূপ একটি নির্জীব কাষ্ঠখন্ড বা লাঠি হযরত মূসার পক্ষে বিরাট অজগরে পরিণত হইয়া যাইত, যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনেই রহিয়াছে।

আমাদের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামেরও এই ধরনের বহু বহু মো'জেযা হাদীছের কেতাব সমূহে বর্ণিত আছে।

(১) একটি নারী তাহার ছেলেসহ ইসলাম গ্রহণ করতঃ হিজরত করিয়া মদিনায় উপস্থিত হইলে পর অল্প দিনের মধ্যেই তাহার ছেলেটি মারা যায়। নিঃসহায় নারীটি ছেলের মৃত্যুর সংবাদ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল; তাহার ছেলের লাশ হযরতের সম্মুখে রক্ষিত ছিল। নারীটি হযরতের পায়ের নিকট বসিয়া অতি কাতর স্বরে দো'আ করিতে লাগিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত ছেলেটি হাত-পা নাড়া দিয়া আবরণের চাদরটি মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিল এবং জীবিত হইয়া উঠিল, এমনকি তাহার মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পরও অনেক দিন সে বাঁচিয়া ছিল। আরও একটি ঘটনা- আবদুল্লাহ (রাঃ) ছাহাবির পুত্র জাবের (রাঃ) ছাহাবীর ঘরে একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) দাওয়াত খাইতে আসিলেন। তথায় তাঁহার জন্য একটি ছাগল জবেহ করা হইয়াছিল। আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন এবং একমাত্র পুত্র জাবের (রাঃ)-কে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় বিরাট সংসারের ব্যয় বহন ও ঋণের চাপে রাখিয়া গিয়াছিলেন। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সকলকে বলিয়া দিলেন সকলেই গোশত খাইবে, কিন্তু হাড্ডি চিবাইবে না। অতপর হযরত (সঃ) ছাগলের গোশতের হাড়গুলি একত্রিত করিলেন এবং ঐগুলির উপর হাত রাখিয়া কিছু দোয়া পড়িলেন, হঠাৎ ছাগলটি পূর্ণ শরীরে জীবিত হইয়া শরীর ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া গেল। এই শ্রেণীর আরও অনেক ঘটনার বিবরণ হাদীছে বিদ্যমান রহিয়াছে।

(২) হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে এই ধরনের মো'জেযা আরও অনেক বর্ণিত আছে- একটি নির্জীব শুষ্ক কাষ্ঠ, খেজুর বৃক্ষের কান্ড- মসজিদের খুঁটি জীবন্ত মনুষের ন্যায় হযরতের বিচ্ছেদে কাঁদিতেছিল। অতপর হযরত (সঃ) উহাকে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিলে শান্ত হইয়াছিল- এই ঘটনা "উসতুয়ানায়ে-হান্নানাহ্"-এর ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। বদরের যুদ্ধে ওকাশা ইবনে মেহছান (রাঃ) এবং ছালামাহ ইবনে আছলাম (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের তরবারী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাদিগকে এক এক খানা গাছের ডালা দিয়াছিলেন যাহা লৌহ তরবারীতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।

(৩) এই শ্রেণীরও বহু ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একটি নারী তাহার ছেলেকে লইয়া হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। ছেলেটি যৌবন বয়সে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু সে ছিল জন্ম-বোবা, কথা বলিতে পারিত না। হযরত (সঃ) ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল ত আমি কে? তৎক্ষণাৎ ছেলেটি বাক শক্তি লাভ করিয়া বলিল, انت رسول الله আপনি আল্লাহর রসূল। আরও একটি ঘটনা– এক লোকের পা সাপের ডিমের উপর পড়িয়াছিল তাহাতে তাহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহার পিতা তাহাকে লইয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাহি অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইল। হযরত (সঃ) ঘটনা শুনিয়া তাহার চোখে থু থু দিলেন তৎক্ষণাৎ তাহার দৃষ্টিশক্তি বহাল হইয়া গেল, সে ৮০ বৎসর বয়সেও সূঁচের ছিদ্রে সুতা দিতে সক্ষম ছিল। এতদ্ভিন্ন বদরের যুদ্ধে ক্বাতাদাহ ইবনে নোমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর চক্ষু ভীষণ আঘাতে খসিয়া পড়িয়াছিল, হযরত (সঃ) হাতে ধরিয়া চক্ষু বসাইয়া দিলেন, তৎক্ষণাৎ চক্ষু ভাল হইয়া গেল যেন উহার মধ্যে কখনও কোন যাতনা অনুভবই করেন নাই। খায়বরের যুদ্ধকালে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চক্ষুদ্বয়ের ভীষণ যাতনা ছিল, হযরতের থুথুতে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ হইয়াছিল।

(৪) অজ্ঞাত বিষয়ের খবর বলিয়া দেওয়ার ঘটনা ত ইতিহাসে অসংখ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যমানায় রোম সম্রাট পারস্য সম্রাটের আক্রমণে ভীষণরূপে পরাজিত হইয়াছিল এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছিলেন, অচিরেই রোমীয়গণ পার্সী গণের উপর জয়লাভ করিবে। এই সম্পর্কে কাফেরদের সঙ্গে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহু বাজিও রাখিয়াছিলেন। অবশেষে রসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্তিই সত্য হইয়াছে। রোম সম্রাট পারস্য সম্রাটের উপর বিরাট জয়লাভ করিয়াছে। ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে ২১ পারায় সূরা রোমের আরম্ভেই উল্লেখ আছে।

আবু হোরায়রা (রাঃ) রাত্রে চোর ধরিয়া গোপনে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, ভোরে হযরত (সঃ) তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন এবং তিন দিন এইরূপ ঘটনা হইয়াছে।

মক্কা অভিযানের গোপন খবরের এক পত্র লইয়া এক নারী মদীনা হইতে মক্কা যাইতেছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ) এবং অপর একজনকে পাঠাইয়া দিলেন সেই পত্র হস্তগত করার জন্য এবং নির্দিষ্টরূপে বলিয়া দিলেন, তোমরা তাহাকে "রওজা-কাখ" নামক স্থানে পাইবে; বাস্তবে তাহাই হইল।

এই ধরনের হাজার হাজার মো'জেযা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রহিয়াছে, যাহার সাক্ষ্য প্রমাণ-যুক্ত বিবরণ "আল-খাছায়েছুল কোবরা" "দালায়েলুন-নবুওয়াহ্ লে-আবিন্ নুয়াঈম" এবং "দালায়েলুন্ নবুওয়াহ লেল-বায়হাক্বী" ইত্যাদি কিতাবে বিদ্যমান আছে। এত মোজেযা থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মত মুসলমানগণ বা তাহাদের কোন দল হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) কে খোদা বা খোদার শরীক বলিয়া উক্তি করে নাই বরং প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে তাহার ঈমানকে প্রমাণিত করার জন্য এই ঘোষণা দান বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে যে–

اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله -

"আমি আমার আকীদা ও বিশ্বাসের ঘোষণা দিতেছি যে, একমাত্র আল্লাহই মা'বুদ– আর কোন মা'বুদ নাই; তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমি এই ঘোষণাও দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা ও তাঁহার রসূল।"

এমনকি কোন সময়ও যেন মুসলমানদের মধ্যে এই আকীদা ও বিশ্বাস বিস্মৃতির ধুম্রজালে ঢাকিয়া যাইতে না পারে সেই জন্য মুসলমানদের প্রতিটি ভাষণ ও অনুষ্ঠানাদির উদ্বোধনের প্রারম্ভে সর্বসমক্ষে এই ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদানের রীতিও ইসলামে আবহমান কাল হইতে প্রবর্তিত রহিয়াছে।

স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও স্বীয় উম্মতের প্রতি এই ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন।

১৬৫৩। হাদীছ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি খলীফাতুল-মোছলেমীন ওমর (রাঃ)-কে সর্বসমক্ষে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়াইয়া এই হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি– তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি– তিনি স্বীয় উম্মতকে সতর্ককরণ পূর্বক বলিয়াছেন, খবরদার! আমার প্রশংসা করিতে এবং মর্যাদা বাড়াইতে অতিরঞ্জিত উক্তি করিবে না– যেরূপ নাছারাগণ মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা সম্পর্কে করিয়াছে।

আমি আল্লাহ সৃষ্ট বান্দা বৈ নহি; (আমাকে আল্লাহ তায়ালার সমতুল্যকারী কোন উক্তি দ্বারা আখ্যায়িত করিও না) হাঁ– আমার সম্পর্কে বল, "আল্লহর বান্দা ও রসূল"।

অর্থাৎ তোমরা আমার সম্পর্কে নাছারাদের ভূমিকা গ্রহণ করিও না– নাছারা বা খৃষ্টানগণ ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তাঁহার মো'জেযা সমূহকে কেন্দ্র করিয়া অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। একদল বলে, ঈসা-মসীহ খোদার বেটা বা ছেলে। আর একদল বলে, ঈসা-মছীহ ও তাহার মাতা তিন খোদার দুই খোদা। আর একদল বলে, ঈসা-মছীহ-ই খোদা।

এমনকি ঐতিহাসিক "অফদে-নাজরান"– নাজরানের গির্জা হইতে আগত নাছারাবাদের বড় বড় পাদ্রীগণের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল মদিনায় স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরবারে ঐসব অলৌকিক ঘটনার দলীল প্রমাণ লইয়াই উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার প্রতি উত্তরে পবিত্র কোরআনের সূরা আলে-ইমরানের প্রাথমিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়; বিস্তারিত বিবরণ এই–

অফদে নাজরান পাদ্রীদের বিশেষ প্রতিনিধি দল

ইয়ামানের অন্তর্গত "নাজরান" একটি প্রসিদ্ধ শহর ছিল, ঐ শহরেই রোমের অধীনে এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ চার্চ বা গির্জা ছিল তৎকালীন খৃস্টান ধর্মীয়দের।

হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) সপ্তম হিজরী সনে দুনিয়ার বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান, গোত্রপ্রধান ও ধর্মপ্রধানদের নিকট ইসলামের দাওয়াত-নামা বা আহবান-পত্র বিশেষ বিশেষ দূত মারফত প্রেরণ করিয়াছিলেন। খৃস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় কেন্দ্র এই নাজরানেও দাওয়াতনামা পাঠাইয়াছিলেন। এই নাজরান গির্জার অধীনে সত্তরের অধিক নগর বা গ্রাম ছিল এবং লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবক যুবক নাগরিক সিপাই ছিল। এতদসত্ত্বেও নাজরানের পাদ্রিগণ ইহুদিদের ভয়ে ভীত ছিল। ইহুদিরা খৃস্টানদিগকে এক কথায় লা-জওয়াব করিয়া দিত যে, "তোমরা যাহাকে তোমাদের ধর্মের প্রধান বল তাহার ত বাপের ঠিক নাই– সে ত জারজ সন্তান, তাহার মৃত্যুই হইয়াছে অপমৃত্যু তথা শূলিতে; শূলিতে মৃত্যু ঘটে অভিশপ্তদের।"

ইহুদীদের এই আক্রমণের প্রতিরোধেই খৃস্টানগণ তাহাদের ছদ্মবেশী গুরু বৈপিতা সেন্টপলের প্রবঞ্চনাময় মন্ত্র গাহিয়া বেড়াইত যে, আমাদের ধর্মপ্রধানের বাপ হইলেন স্বয়ং আল্লাহ এবং শূলিতে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিলেও সেই মৃত্যু অপমৃত্যু ছিল না, বরং তিনি স্বয়ং শূলিবিদ্ধ হইয়া পিতার নিকট হইতে সকলের পাপ মোচন করাইয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এইসব দাবী নিছক মিথ্যা ভিত্তিহীন, এই সবের মূলে কোন যুক্তি প্রমাণ মোটেই নাই।

পূর্বেও বলা হয়েছে, ইসলাম হইল বাস্তব ও সত্যের প্রতীক ধর্ম। ইসলাম মিথ্যার আশ্রয় মোটেই লয় না এবং সত্যের প্রচার এবং প্রকাশ্যেও বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখায় না, তাই ইসলামের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এবং ইসলামের কেতাব পবিত্র কোরআন হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের গুণগান ও প্রশংসা করিল। তাঁহার ও তাঁহার মাতার মহত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া অনেক অনেক বিবৃতি দান করিল এবং ঈসার জন্ম-বৃত্তান্তের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া এবং সে সম্পর্কে বাস্তব ও সত্য ঘটনার উদঘাটন করিয়া ইহুদিদের মিথ্যা ও ভ্রষ্ট অপবাদের দাঁত-ভাঙ্গা উত্তর প্রদান করিল। পবিত্র কোরআন স্পষ্ট ঘোষণা দিল যে,

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পাক-পবিত্র বিশিষ্ট নবী ছিলেন; তাঁহার সম্পর্কে অপবাদকারীগণ আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত।

এইসব বিবৃতি ও ঘোষণায় ইসলামের তরফ হইতে ইহুদিদের মোকাবিলায় নাছারাদের পক্ষ সমর্থন ছিল; কাজেই নাছারাগণ খুব সন্তুষ্ট হইল এবং তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। নবম হিজরী সনের প্রারম্ভে তাহাদের প্রধানতম কেন্দ্র নাজরানের পাদ্রিগণ বিশেষ শান-শওকতের সহিত– চৌদ্দ গোত্রের প্রধান প্রধান পাদ্রীগণ, তৎসঙ্গে তিনজন সর্বোচ্চ নেতাসহ মোট ষাটজন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মদিনায় আসিল এবং হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল।

তাহাদের সর্বপ্রধান নেতা ছিল "আব্দুল মসীহ ওরফে আকেব" প্রধান ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ লাটপাদ্রী ছিল "আবু হারেছা" এবং তাহাদের রাহবর বা পথ-পরিচালক নেতা ছিল "আইহাম ওরফে ছাইয়্যেদ"।

প্রতিনিধি দল মদিনায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের দুই প্রধান– আবদুল মছীহ এবং আইহামকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামের সঙ্গে কথা বলার জন্য মনোনীত করিল। নেতাদ্বয় হযরতের নিকট উপস্থিত হইলে হযরত (সঃ) তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। তাহারা বলিল, আমরা ত পূর্ব হইতেই মুসলমান (তথা আল্লাহ তায়ালাকে স্বীকার করিয়া থাকি)। হযরত (সঃ) বলিলেন, আপনাদের ইসলামের দাবী মিথ্যা দাবী; আপনারা ত ইসলামের পরিপন্থী আকীদা ও কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। আপনারা (হযরত ঈসাকে) আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেন, ক্রুশকে পূজনীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং শূকর খাইয়া থাকেন (যাহা কোন নবীর ধর্মেই হালাল নয়)।

নেতাদ্বয় তদুত্তরে বলিল, হযরত ঈসা যদি আল্লাহর পুত্র না হন তবে পিতা কে? এই যুক্তির উপরই তাহারা অধিক জোর দিল যে, কোন মানুষ হযরত ঈসার পিতা ছিল না, সুতরাং আল্লাহ তায়ালাই তাঁহার পিতা, নতুবা তাঁহাকে জারজ বলিতে হয়, অথচ কোরআন ও ইসলাম এই কথা ঘোর প্রতিবাদকারী।

এতদ্ভিন্ন নাছারাগণ হযরত ঈসা খোদা হওয়ার এই দলিলও বয়ান করিত যে, তিনি মৃতকে জীবিত করিতে পারেন, অন্ধকে চক্ষু দান করিতে পারেন, মানুষ নিজ ঘরে কি খাইয়াছে কি করিয়াছে এইরূপ গায়েবের খবর বলিতে পারেন।

এই নাজরান প্রতিনিধি দলের বিতর্ক উপলক্ষ্যেই নাছারাদের বক্তব্যাদি খন্ডন পূর্বক সূরা আলে এমরানের প্রথম ৮৪টি আয়াত নাযিল হইয়াছিল। উহাতে নাছারাগণকে লক্ষ্য করিয়া চারটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে।

প্রথমত ঃ অতি সংক্ষেপে আল্লাহ তায়ালার দুই তিনটি এমন গুণ বা ছেফতের উল্লেখ করা হইয়াছে যদ্বারা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে, অন্য কেহই তাঁহার শরীক, সাথী বা সমকক্ষ মা'বুদ; উপাস্য করা যাইতে পারে না। সূরাটির প্রারম্ভেই ঘোষণা করা হইয়াছে, আল্লাহ যিনি তিনি হইলেন الحى "চিরজীবন্ত, অনাদি অন্তত" এবং القيوم "সারা বিশ্বের ধারকও রক্ষক;" সারা বিশ্বকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনিই উহার ধারণকারী ও অস্তিত্ব রক্ষাকারী। সেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই মা'বুদ উপাস্য ও পূজনীয় হওয়ার যোগ্য নহে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর আরও একটি গুণ বিশেষরূপে উল্লেখ হইয়াছে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ـ

"নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, আল্লাহ এমন যে, তাঁহার সম্মুখে আসমান-জমিনের কোথাও একবিন্দু বস্তুও গোপন অজ্ঞাত অজানা থাকিতে পারে না।"

পক্ষান্তরে যে কোন নবী মো'জেজা স্বরূপ গায়েবের কোন বিষয় বলিয়া দিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা হয় নেহাত সীমাবদ্ধ। যেমন, ঈসা (আঃ) এই সম্পর্কে গোপন খবর বলিতে পারিতেন যে, একজন লোক সে আজ কি খাইয়াছে এবং বাড়ীতে কি কি বস্তু সঞ্চিত রাখিয়াছে। এই সীমার বাহিরে অন্য কোন গায়েবের

খবর তিনি বলিতে পারিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ ঈসা (আঃ) এবং তাঁহার মাতার জন্ম-বৃত্তান্ত এমনভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যদ্বারা অতি সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁহারা উভয়েই আল্লাহ তায়ালার মখলুক বা সৃষ্ট মানুষ ছিলেন। অবশ্য হযরত ঈসার সৃষ্টি ও তাঁহার জন্মলাভ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতে হইয়াছিল। সেই কুদরত কি ধরনের ছিল তাহাও স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে–

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ـ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ـ

"নিশ্চয় ঈসার (বিনা-বাপে জন্মের) আশ্চর্যজনক বৃত্তান্ত আল্লাহ তায়ালার পক্ষে (মোটেই আশ্চর্যজনক নহে। তাঁহার জন্মের ব্যবস্থাটা) আদমের (জন্ম) বৃত্তান্তের ন্যায়ই। আদমকে আল্লাহ তায়ালা মাটি দ্বারা তৈরী করিয়া আদেশ করিয়াছিলেন, "কুন্– হইয়া যাও" সঙ্গে সঙ্গে আদম (জীবন্ত) হইয়া গিয়াছিলেন।"

হযরত আদম যেরূপ মাতা-পিতা ব্যতিরেকে আল্লাহর কুদরত শুধু আল্লাহর আদেশ দ্বারা জন্মলাভ করিয়াছেন, হযরত ঈসাও তদ্রূপ কোন পিতার স্পর্শন ব্যতিরেকে আল্লাহ তায়ালার কুদরতে শুধু আল্লাহর অদশ দ্বারা মাতৃগর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা এই তথ্য সম্পর্কে বলিয়াছেন–

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ـ

"এই সত্যটি তোমার মহা প্রভু-পরওয়ারদেগার হইতেই প্রচারিত; এই সম্পর্কে কোন সংশয়ে পড়িও না।" এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ গুণও উল্লেখ হইয়াছে যে,

هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ـ

"মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা যেভাবে ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে মাতৃগর্ভে তৈরী ও গঠন করিতে পারেন।" যেমন– মাতৃ বীর্যের সঙ্গে পিতৃবীর্যের সংযোজনেও গঠন করিতে পারেন, যেরূপ সাধারণতঃ হয়; বিনা সংযোজনেও গঠন করিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ কেতাবধারী বিশেষতঃ নাছারাগণকে খাঁটী তৌহিদ ও একত্ববাদের প্রতি আহবান জানানো হইয়াছে, যদ্বারা নাছারাগণ উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে একত্ববাদী নহে, বরং মোশরেক।

নাছারাগণ হযরত ঈসাকে খোদার বেটা বলা সত্বেও, অধিকন্তু হযরত ঈসা এবং তাহার মাতাকে তিন খোদার দুই খোদা বলা সত্বেও, মুয়াহ্হেদ বা একত্ববাদী হওয়ার দাবী করিয়া থাকে। এস্থলে তাহাদের সেই দাবীকে অসার ও অবাস্তব সাব্যস্ত করতঃ আহবান জানান হইয়াছে যে, তোমরা মুখে মুখে যে একত্ববাদের দাবী কর কার্যস্থলে উহা প্রতীয়মান করার সৎ সাহস লইয়া অগ্রসর হও।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

"হে কেতাবধারীগণ! যে বিষয়টি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ঐক্যমতপূর্ণ যে, আমরা এক আল্লাহ বিভিন্ন অন্য কাহারও এবাদত-উপাসনা করিব না, কোন জিনিসকে তাঁহার শরীক-সাথী সাব্যস্ত করিব না এবং মানুষ মানুষকে "রব" প্রভু বা রক্ষাকর্তা ত্রাণকর্তা, বিধানকর্তারূপে গ্রহণ করিব না (অর্থাৎ তৌহীদ ও একত্ববাদ, যে সম্পর্কে আমাদের ত স্থির সিদ্ধান্ত আছেই এবং তোমরাও উহার দাবী করিয়া থাক)– কার্যস্থলে বাস্তব ক্ষেত্রে এই সত্যকে প্রতীয়মান করিতে অগ্রসর হও।"

চতুর্থঃ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর দাবী করিয়াও বিপরীতমুখী ইহুদি-নাছারাগণ নানারূপ মিথ্যা ও আজগুবী উক্তি করিয়া থাকে, সেই সম্পর্কেও এই সূরায় মূল ঘটনার বর্ণনা আছে, যাহার বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে আসিবে।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ নাযিল হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দের সম্মুখে ঐসব দলীল-প্রমাণ ও বিষয়বস্তু ব্যক্ত করিলেন। তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরূত্তর হইল, তবুও ইসলাম গ্রহণে অগ্রসর হইল না। তখন রসুলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তায়ালার আদেশ মোতাবেক সর্বশেষ পন্থা অবলম্বন করতঃ তাহাদিগকে "মোবাহালাহ"-এর প্রতি আহবান জানাইলেন। "মোবাহালাহ" অর্থ কোন বিতর্কে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষ এই রূপে দোয়া করিবে যে, হে আল্লাহ! আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যে পক্ষ স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী সেই পক্ষের উপর তোমার অভিশাপ ও গজব পতিত হউক, সে পক্ষ তোমার গজবে ধ্বংস হইয়া যাউক।

উভয় পক্ষের মনোবল ও দৃঢ়তা যাচাই-এর উদ্দেশ্যে বিষয়টিকে অধিক জোরদার করার জন্য উভয় পক্ষের নিজ নিজ পরিবার পরিজনকেও এই বদ-দোয়ায় শামিল করা যাইতে পারে। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) নাজরান প্রতিনিধি দলকে এইরূপ চূড়ান্ত মুবাহালার প্রতিই আহবান করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট নির্দেশেই ঐরূপ করিয়াছিলেন– যাহার বিবরণ পবিত্র কোরআনে এই–

فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآئَنَا وَاَبْنَآئَكُمْ وَنِسَآئَنَا وَنِسَآئَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ـ

অর্থঃ (মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা সম্পর্কে যে বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইল– তাঁহার সম্পর্কে) ইহাই হইল বাস্তব তথ্য– প্রভু-পরওয়ারদেগারের বর্ণিত; অতএব এই সম্পর্কে দ্বিধাবোধের অবকাশ রাখিবেন না। অতপর ঈসা সম্পর্কে (এই সত্যের বিপরীত) যে কেহ আপনার সঙ্গে হঠকারিতা ও বৃথা তর্ক করে তাহাকে "বলুন, আস! আমরা (উভয়ে) আমাদের সন্তান-সন্ততি, পরিবারবর্গকে নিজ নিজ সঙ্গে লইয়া একত্রিত হই এবং আল্লার দরবারে কায়মনোবাক্যে এই রূপ দোয়া করি যে, আল্লাহর লা'নত-অভিশাপ ও গজব হউক হকের বিরোধী মির্থ্যাবাদী পক্ষের উপর।"

মুসলিম শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে, এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বীয় কলিজার টুকরা কন্যা ফাতেমাকে এবং তাঁহার স্বামী ও জামাতা আলী (রাঃ)-কে এবং পৌত্র হাছান ও হোছাইনকে (সহজ সুলভরূপে) ডাকিয়া একত্র করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করতঃ বলিলেন, হে আল্লাহ! ইহারা আমার পরিজন। (অর্থাৎ মোবাহালাহ করার জন্য আমি ইহাদিগকে সঙ্গে রাখিব।)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (সঃ) ফাতেমা, আলী এবং হাছান ও হোছাইনকে সঙ্গে লইয়া মোবাহালাহ করার উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমি দোয়া করা আরম্ভ করিলে তোমরা আমীন বলিতে থাকিও। (রুহুল মায়ানী ২–১৮৮)

এইরূপে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) অগ্রগামী হইয়া মোবাহালার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করা পূর্বক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং প্রতিনিধি দলের প্রধানগণকে মোবাহালার জন্য অগ্রসর হইতে বলিলেন।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা সত্য। আল্লাহ বলিয়াছেন–

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَ هُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ .....

"কিতাবধারী আলেমগণ মুহাম্মাদ (সঃ) কে আল্লাহর রসূলরূপে সন্দেহাতীতরূপে চিনিয়া থাকে– যেরূপ তাহারা স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে নিজ সন্তানরূপে চিনে, তবুও তাহাদের এক শ্রেণীর লোক জানিয়া শুনিয়া স ত্য গোপনে লিপ্ত আছে।" (পারা– ২, রুকু– ১)

নাজরান প্রতিনিধি দলের প্রধানগণও এই শ্রেণীরই ছিল, সুতরাং তাহারা আল্লাহর রসূলের বদ দোয়ার তলে আসিতে সাহসী হইল না। তাহারা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে আবেদন

করিল যে, আমরা এই সম্পর্কে চিন্তা ও পরামর্শ করিব এবং তিন দিনের অবকাশ চাহিয়া নিল। তাহাদের পরামর্শে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, মোবাহালায় অবতীর্ণ হইলে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য, সুতরাং যে কোন বিনিময়েই হউক সন্ধি করিতেই হইবে।

অতপর তাহারা হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া এই আবেদন করিল যে, আমরা মোবাহালায় অবতীর্ণ হইব না। আমরা আমাদের সমগ্র দেশসহ আপনার বাধ্যগত অধীনস্থ করদাতা রূপে থাকিব। হযরত (সঃ) তাহাদের আবেদন গ্রহণ করিলেন এবং রাষ্ট্রীয় কর হিসাবে বাৎসরিক ২০০০০ জোড়া কাপড়, ৩৩টি লৌহ বর্ম, ৩৩টি উট এবং ৩৪টি ঘোড়া তাহাদের উপর ধার্য করিয়া দিলেন (তফছীর রুহুল মায়ানী ২-৮৮)। এতদ্ভিন্ন ২০০০ "উকিয়া" তথা ৮০০০০ দেরহাম (প্রায় ২০০০০ টাকা) নগদও ধার্য করিয়াছিলেন (ফতহুল বারী ৮-৭৭)। হযরত (সঃ) তাহাদিগকে একটি নিরাপত্তা দান-পত্রও লিখিয়া দিয়াছিলেন, যাহার নকল সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস ভান্ডার "তবকাতে-ইবনে ছা'য়াদ" নামক কিতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। (১-২৮৭।)

তাহারা হযরতের নিকট এই আবেদনও করিল যে, একজন বিশ্বস্ত লোক আমাদের উপর নিযোগ করিয়া দেন; যিনি আমাদের হইতে কর আনিবেন। হযরত (সঃ) আবু ওবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রাঃ)-কে মনোনীত করিলেন। বোখারী শরীফে নাজরান প্রতিনিধি দলের বিবরণ সম্পর্কে ২৬৯ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ আছে তথায় এ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি আছে-

১৬৫৪। হাদীছ ঃ হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আবদুল মছীহ ওরফে) আ'কেব এবং (আইহাম ওরফে) ছাইয়্যেদ নাজরানের এই প্রধানদ্বয় (সঙ্গীগণসহ) রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল।

(ঘটনা প্রবাহের মধ্যে তাহারা মোবাহালার সম্মুখীন হইয়া প্রথম অবস্থায় এইরূপ ভাব দেখাইল যেন) তাহারা হযরতের সঙ্গে মোবাহালাহ করিতে প্রস্তুত আছে। অতপর তাহাদের একজন অপরজনকে বলিল, খবরদার! এই ব্যক্তির সঙ্গে মোবাহালায় অবতীর্ণ হইও না। তিনি যদি সত্যই হইয়া থাকেন (যেরূপ আমাদের ধারণা) এবং আমরা তাহার সঙ্গে মোবাহালায় অবতীর্ণ হই তবে (নিশ্চয় আমাদের উপর তাঁহার অভিশাপ পতিত হইবে, ফলে) আমরা রেহাই পাইব না, এমনকি আমাদের বংশধরগণ পর্যন্ত রেহাই পাইবে না।

অবশেষে (মোবাহালায় অবতীর্ণ না হওয়া সাব্যস্ত করিয়া) তাহারা হযরতের নিকট এই আবেদন জানাইল যে, (আমরা মোবাহালাহ করিব না, আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিলাম। সেমতে রাষ্ট্রীয় কর হিসাবে) আপনি আমাদের উপর যাহা ধার্য করিবেন আমরা তাহাই পরিশোধ করিব। আর আপনি আমাদের জন্য আপনার পক্ষ হইতে একজন বিশ্বস্ত লোক মনোনীত করিয়া দিন- বিশ্বস্ত নয় এমন লোক পাঠাইবেন না। হযরত ফরমাইলেন, নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত লোকই পাঠাইব- পূর্ণ বিশ্বস্ত। (আল্লাহর রসূলের নিকট পূর্ণ বিশ্বস্তরূপে পরিচয় লাভের) এই সুযোগের প্রতি ছাহাবীগণ প্রত্যেকে তাকাইয়া রহিলেন। অতপর হযরত (সঃ) আবু ওবায়দা (রাঃ) কে এই পদে মনোনীত করিলেন। তিনি যখন যাত্রা করিবেন তখন হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহার প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ততায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

নাজরান প্রতিনিধি দলের সর্বশেষ খবর এই যে, তাহারা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিয়াছিল এবং ধার্যকৃত রাষ্ট্রীয় কর বরণ করতঃ হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতিনিধি ও তাঁহার নিরাপত্তাদানপত্র লইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছিল। অল্পদিন পরেই প্রতিনিধি প্রধান- আবদুল মছীহ ওরফে আ'কেব এবং আইহাম ওরফে সাইয়েদ তাঁহারা পুনরায় হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ফতহুল বারী ৮-৭৭)

মো'জেযা পয়গাম্বরের জন্য আল্লারই দান

পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, মো'জেযা কখনও নবীর নিজ ক্ষমতা বলে প্রদর্শিত হয় না, আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতেই নবীকে মো'জেযা দান করা হইয়া থাকে। নবীর নবুয়তকে সর্বসমক্ষে প্রমাণিত করার জন্য। সুতরাং মোজেযা যত বড়ই হউক না কেন উহার দ্বারা খোদার সমকক্ষ হওয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

এই সত্যটি যেন লোকদের খেয়াল হইতে মুহূর্তের জন্যও লুকায়িত না থাকে এবং এই ব্যাপারে যেন শয়তান লোকদিগকে প্রবঞ্চনায় ফেলিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) বিভিন্ন মো'জেযা প্রদর্শনের প্রতিমুহূর্তে এবং দমে দমে প্রত্যেকটি মো'জেযার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে নুতনভাবে এই ঘোষণা দিতে রহিয়াছেন যে, এই অলৌকিক কার্যটি আমার হস্তে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার আদেশে এবং তাহার কুদরত বলেই সমাধা হইতেছে। হযরত ঈসা (আঃ) বার বার এটা ঘোষণার মারফত ঐ সত্যকেই উপলীব্ধ করাইয়াছেন যে, এই মো'জেযার মধ্যে আমার এমন কোন কৃতিত্ব নাই যদ্দ্বারা আমার পক্ষে খোদার ন্যায় শক্তিমত্তা ও তাঁহার সমকক্ষতা প্রমাণিত হইতে পারি।

দুঃখের বিষয় নাছারা বা খৃস্টানগণ সেন্টপলের ন্যায় ইহুদী-জাত ছদ্মবেশী মোনাফেকের প্রবঞ্চনায় পতিত হইয়াছে, অথচ স্বয়ং ঈসা আলাইহিচ্ছালামের প্রচার ও ঘোষণাদি অতি সুস্পষ্ট ছিল। হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের ঐসব প্রচার ও ঘোষণা সমূহ আজও অকাট্য কোরআন মজিদের মারফৎ সারা বিশ্বের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিভিন্ন মোজেযা সম্পর্কে হযরত ঈসার ঘোষণা কতই না সুস্পষ্ট ছিল।

اَنِّیْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّیْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِیْ بُيُوْتِكُمْ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

আমি তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতে (রসূল হওয়ার) দলিল প্রমাণ নিয়া আসিয়াছি– (১) আমি তোমাদের সম্মুখে কর্দম দ্বারা পাখীর আকৃতি বানাইয়া অতপর উহার মধ্যে ফুঁৎকার মারিব, ফলে উহা আল্লাহর আদেশে বাস্তবেই পাখী হইয়া যাইবে। (২) আর আমি জন্ম-অন্ধকে ভাল করিতে পারি। (৩) (দুরারোগ্য) কুষ্ঠরোগ ভাল করিতে পারি। (৪) এবং মৃতকে জীবিত করিতে পারি। এইসব আল্লাহর আদেশেই হইবে। (৫) আরও আমি বলিয়া দিতে পারি তোমরা নিজ নিজ বাড়ীতে যাহা খাইয়াছ এবং যাহা কিছু সঞ্চিত রাখিয়াছ। নিশ্চয়ই এই সবের মধ্যে (আমার রসূল হওয়ার) স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের জন্য রহিয়াছে যদি তোমরা ঈমান গ্রহণে ইচ্ছুক হও।* (পারা– ৩, রুকু– ১৩)

এতদ্ভিন্ন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও এই ভ্রষ্ট নছারাহগণকেই শুনাইবার জন্য কেয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ)-কে ডাকিয়া যখন স্বীয় প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি লোকদের মধ্যে

---

* হযরত ঈসার উল্লিখিত মো'জেযাসমূহ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হওয়ায় প্রবৃত্তির ধ্বজাধারী, নবীদের মো'জেযা অস্বীকারকারী পূর্ব সমালোচিত পন্ডিত সাহেব তথাকথিত তফছীরুল কোরআনে উল্লেখিত আয়াতসমূহে ভাঙ্গা-গড়া ও নানারূপে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার সমাবেশপূর্বক গোজামিল দানের যে অভিনয় করিয়াছেন তাহা হইতে রক্ষা পাইবার দুইটি উপায় আছে। একটি হইল কোরআন-হাদীছের প্রগাঢ় জ্ঞান, আর একটি অকাট্য ঈমান।

হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কেও উক্ত পন্ডিত স্বভাব ও প্রকৃতির লেজ ধরিয়া রহিয়াছেন এবং মারইয়্যামের সঙ্গে নাজ্জার নামক এক ব্যক্তির বিবাহ পড়াইয়া দিয়া তদ্দ্বারা স্বাভাবিক রীতির মাধ্যমে হযরত ঈসার জন্ম কাহিনী গাথিয়াছেন। এক কথায় তিনি আল্লাহ তায়ালাকেও স্বাভাবিক নিয়মের বাহিরে যাইতে দিতে রাজী নহেন।

এই ব্যাপারে তিনি খৃস্টানী বাইবেলের কিছু তথ্য গ্রহণ করিয়া পরে বাইবেলকেও মাত করিয়া দিয়াছেন। বাইবেলে যোশেফের (ইউসুফ) সঙ্গে মরয়্যামের বিবাহ কাহিনী আছে, কিন্তু মরয়্যাম গর্ভে হযরত ঈসার জন্ম যোশেফ বা কোন পুরুষের স্পর্শনে হইয়াছে– এইরূপ ধারণাকে বাইবেলও খন্ডন করিয়াছে। (মথি ২য় পৃষ্ঠা–প্রভু যিশুর জন্ম বিবরণ দ্রষ্টব্য)

পন্ডিত সাহেবের ঈমান ও ইসলাম বিরোধী মতামতের বিতর্কে সময় অপচয়ে উৎসাহ হয় না; অতি ছোট একটি উজ্জল যুক্তির উপরই এই আলোচনা ক্ষান্ত করিতে চাই। (অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

খোদায়ী দাবীর প্রচার করিয়াছিলেন কি? (এই প্রশ্নোত্তরের পূর্ব বিবরণ পারা– ৭, রুকু– ৬ -এর আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) তখনও আল্লাহ তায়ালা প্রথমে স্বয়ং ঈসা (আঃ)-কে সম্বোধনপূর্বক বলিবেন যে, আপনি এই, এই মো'জেযা দেখাইয়াছিলেন– এইসব একমাত্র আমারই আদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং এইসব মো'জেযার দ্বারা আপনার খোদায়ী কিরূপে প্রমাণিত হইতে পারে? বিশ্ববাসীর অবগতির জন্য কেয়ামতের দিনের সেই বিবরণীর বর্ণনাও পবিত্র কোরআনে প্রদত্ত হইয়াছে।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ـ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ـ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً ـ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ـ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا ـ

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা রসূলগণকে তাহাদের উম্মতের ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। সেই দিনের একটি স্মরণীয় ঘটনা– আল্লাহ বলিবেন, হে মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা! স্মরণ কর, আমি যেসব নেয়ামত দান করিয়াছিলাম তোমাকে এবং তোমার মাতাকে– যখন তোমার সাহায্য করিয়াছিলাম জিব্রাঈল ফেরেশতা দ্বারা। তুমি (আমার কুদরতে) নবজাত শিশু এবং বয়স্ক উভয় অবস্থায় একই ধরনের কথা বলিতে সক্ষম ছিলে এবং আমি তোমাকে আসমানী কেতাবের ও সূক্ষ্ম বিষয়াবলীর বিশেষতঃ তৌরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং তুমি কর্দম দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করিতে আমার আদেশে; তারপর ঐ মাটির (তৈরী আকৃতিতে শুধু) ফুৎকার মারিতে,

فَتَكُوْنَ طَيْرًا بِاِذْنِىْ ـ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ ـ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ ـ

ফলে উহা হইয়া যাইত বাস্তব পাখী আমার আদেশে। এবং তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করিতে সক্ষম হইতে আমার হুকুমে এবং মৃতকে (জীবিত করিয়া কবর হইতে) তুমি বাহির করিতে আমারই হুকুমে। (পারা– ৭, রুকু– ৫)

আসমান হইতে খাদ্য লাভের মো'জেযা

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের একটি বিশেষ মো'জেযা– একদা তাঁহার বিশেষ অনুগত "হাওয়ারী" নামে আখ্যায়িত একদল লোক তাঁহার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করিল যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য প্রকাশ্য মো'জেযা স্বরূপ যদি আসমান হইতে আমাদের জন্য তৈরী খানা পাঠাইয়া দিতেন।

মো'জেযার জন্য নবীকে ফরমাইশ করার পরিণাম ভাল হয় না বলিয়া হযরত ঈসা (আঃ) তাহাদিগকে সতর্ক করিলেন। তাহারা আরজ করিল, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, ঐরূপ খানা খাইয়া আমরা বরকত হাসিল করিব এবং এইরূপ প্রত্যক্ষ মো'জেযা দৃষ্টে আমাদের ঈমানের মজবুতী বাড়িয়া যাইবে এবং আমরা লোকদিগকে বলিতে পারিব যে, এইরূপ স্পষ্ট মো'জেযা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

বস্তুতঃই যদি ইউসফের সঙ্গে মরয়্যামের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া যথারীতি তাহার স্পর্শনে হযরত ঈসার জন্ম হইয়া থাকিত তবে ইহুদীদের অপবাদ ও নাছারাদের অতিরঞ্জনের খন্ডনে পবিত্র কোরআন যেসব দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনার এবং আল্লাহ তায়ালার সর্বশক্তিমত্তা স্মরণ করাইবার এবং আদমের সৃষ্টি বৃত্তান্তের তুলনা উল্লেখের যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে সেই ভূমিকা গ্রহণ শুধু নিরর্থকই নয় বরং অহেতুক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সব কিছুর প্রতিবাদে শুধু এতটুকু প্রকাশ করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট ছিল যে, বৈধ সম্পর্কীয় পিতা-মাতা ইউসুফ ও মরয়্যামের ওরসে ঈসা জন্মলাভ করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হযরত ঈসা ও মারইয়্যাম সম্পর্কে এত এত দীর্ঘ বিবৃতি কোরআনে ব্যক্ত হইল; কিন্তু বিশ্বজোড়া বিতর্কের মূলোচ্ছেদকারী ইউসুফের সঙ্গে মারইয়্যামের শুভ-পরিণয়ের খবরটা কোথাও করা হইল না! আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোরআনের প্রায় শত শত স্থানে عيسى بن مريم عيسى بن مريم মায়্যাম-পুত্র ঈসা, মারয়্যাম-পুত্র ঈসা বলা হইল; কোন এক স্থানেও ইউসুফ-পুত্র ঈসা বলা হইল না।

তদুপুরি ঐতিহাসিক নাজরান প্রতিনিধি দলের প্রশ্ন, যে হযরত ঈসা খোদার বেটা না হইয়া থাকিলে তাঁহার পিতা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) নানারূপে দীর্ঘ বিষয়াবলী, এমনকি সর্বশেষ চূড়ান্ত পন্থারূপে মোবাহালার পথ অবলম্বন করিলেন, (বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে) একবারও উক্ত প্রশ্নের সহজ উত্তরটা মুখেও আনিলেন না যে, তাঁহার পিতা ছিলেন ইউসুফ নাজ্জার। এইসব তথ্য দৃষ্টে হযরত ঈসা ইউসুফের পুত্র হওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুধি পাঠকবর্গের উপরই ন্যস্ত রহিল।

হযরত ঈসা (আঃ) যখন তাহাদের উদ্দেশ্য খারাপ নয় দেখিলেন; তখন তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করিলেন। আল্লাহ তায়ালা দোা কবুল করিলেন এবং তাহাদিগকে সতর্কবাণীও শুনাইলেন যে, অতপর যদি তোমাদের কেহ এই মো'জেযার পূর্ণ হক আদায় না করিয়া বিপথগামী হয় তবে আমি তাহাকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করিব।

মোফাচ্ছেরগণ লিখিয়াছেন, আল্লাহর কুদরতে ফেরেশতাগণ মারফত আসমান হইতে তৈরী রুটি ও গোশত ভর্তি খাঞ্চা তাহাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইল।

তিরমিযী শরীফে একখানা হাদীছ বর্ণিত আছে, আসমান হইতে তাহাদের জন্য তৈরী খানা– রুটি গোশত অবতীর্ণ হইল এবং তাহাদের প্রতি এই নির্দেশও আসিল যে, ইহা হইতে তৃপ্তিপূর্ণ পরিমাণ খাইতে পারিবে, কিন্তু আগামী দিনের জন্য রাখিয়া দিবে না। তাহাদের অনেকে এই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আল্লাহর গযবে পতিত হইল; আকৃতি মছ্‌খ্ হইয়া তাহারা বাঁদর ও শূকরের আকৃতিতে পরিণত হইয়া গেল। ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নিম্নরূপ–

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ـ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

একটি স্মরণীয় ঘটনা– যখন হাওয়ারিগণ বলিয়াছিল, হে মারইয়্যাম পুত্র ঈসা পয়গম্বর! ইহা কি সম্ভব যে, প্রভু পরওয়ারদেগার আপনার অছিলায় আমাদের প্রতি আসমান হইতে তৈরী খানা পাঠাইয়া দেন? ঈসা (আঃ) বলিলেন, (মোজেযার ফরমাইশ করিও না) আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা খাঁটি মোমেন হইয়া থাক।

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

হাওয়ারিগণ আরজ করিল, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, (বরকতের জন্য) আমরা ঐরূপ খানা খাইব এবং আপনার প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি উহা আরও দৃঢ় হইবে এবং প্রকাশ্য ঘটনায় দেখিয়া নিব, আপনি (নবী হওয়ার দাবীতে) সম্পূর্ণ সত্য এবং (অন্যদের জন্য) আমরা আপনার সত্যতার প্রমাণ স্বচক্ষে অবলোকনকারী সাক্ষী হইব।

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ـ

ঈসা (আঃ) দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমাদের প্রতি আসমান হইতে তৈরী খানার খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন যাহা আমাদের বর্তমান ও পরবর্তী সকলের জন্যই বিশেষ আনন্দের কারণ হইবে এবং আপনার পক্ষ হইতে আমার সত্যতার বিশেষ নিদর্শন হইবে। এবং আপনার পক্ষ হইতে আমাদের জন্য বিশেষ রিজিক স্বরূপও উহা দান করুন; আপনি ত সর্বোত্তম দাতা।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ـ

আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আমি উহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিব, কিন্তু অতপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিআমার আনুগত্যহীনতার পরিচয় দিবে তাহাকে আমি এমন কঠোর শাস্তি প্রদান করিব, যাহা (সাধারণতঃ) জগতের কাহাকেও প্রদান করি না। (পারা–৫, রুকু–৭)

হযরত ঈসা কর্তৃক মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সুসংবাদ প্রচার

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার পরবর্তী সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সম্পর্কে শুধু সুসংবাদই দান করিয়াছিলেন না, বরং তিনি তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ বহনকে স্বীয় নবুয়তের একটি বিশেষ দায়িত্বরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে স্বয়ং হযরত ঈসার ঘোষণা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ـ

তখনকার ঘটনা স্মরণ কর, যখন মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা বলিয়াছিলেন, হে বনী-ইস্রাঈলগণ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার রসূল ও আমার পূর্ববতী তওরাত কিতাবের সমর্থনকারী এবং আমার পরে "আহমাদ" নামীয় এক রসূল আসিবেন তাঁহার সুসংবাদ বহনকারী হইয়া আসিয়াছি। (সূর ছফ, পারা-২৮ পাঃ)

১৬৪৬। হাদীছ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রসূল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাহি অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি- তিনি বলিয়াছেন, আমি (নবীগণের মধ্যে) সর্বাধিক নিকটবর্তী হইলাম মারয়্যাম-পুত্র ঈসার- দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও; আমাদের উভয়ের মধ্যে অন্য নবীর আবির্ভাব হয় নাই। নবীগণের পরস্পর সম্পর্ক ঐ ভ্রাতৃবৃন্দের সম্পর্কের ন্যায় যাহাদের পিতা একজন এবং মাতা ভিন্ন ভিন্ন। (সকল নবীগণের প্রচারিত দ্বীন ও ধর্মের মূল একই; বিভিন্নতা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে।)

ব্যখ্যা ঃ আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) ইহকালে হযরত ঈসার সর্বাধিক নিকটবর্তী ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কধারীও ছিলেন। নিকটবর্তীতা তো সুস্পষ্ট, কারণ তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোন নবী আসেন নাই। বিশেষ সম্পর্ক এই সূত্রে যে, ঈসা (আঃ) যে নবীর আগমনের সুসংবাদ বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছিলেন সেই নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-ই ছিলেন। পরকালেও তাঁহাদের উভয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইবে। বিশ্ববাসী সকলে যখন কেয়ামতের মাঠে ভীষণ কষ্ট-যাতনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শাফায়াতের উদ্দেশ্যে আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন নবীগণের শরণাপন্ন হইবে এবং এক এক নবী নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পূর্বক অন্য নবীর নাম পেশ করিবেন তখন সর্বশেষে ঈসা (আঃ) হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নাম প্রস্তাব করিবেন। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কোন ওজর আপত্তি না করিয়া শাফায়া'তের জন্য অগ্রসর হইবেন।

হযরত ঈসার জাগতিক জীবনের শেষ বৃত্তান্ত

হযরত ঈসার জন্ম বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়া যেরূপ ইহুদীরা অপবাদের ঝড় তুলিয়াছিল এবং নাছারারা অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইয়াছিল, তদ্রূপ হযরত ঈসার ইহজগত ত্যাগের বিষয়টি লইয়াও ইহুদীরা নানারূপ অপবাদ গাড়িয়াছে যে, তাহারা হযরত ঈসাকে বন্দী করিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং ভীষণ লাঞ্ছিত ও অপমানিতরূপে শূলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু অপমৃত্যু ছিল। নাছারারা মূল বিষয় হইতে অজ্ঞ ও দুর্বলচেতারূপে ইহুদীদের সমস্ত অপবাদ নতশিরে বরণ করতঃ এই বলিয়া মুখ রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে যে, হযরত ঈসা ঐ দুঃখ-যাতনায় মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় পিতার নিকট হইতে লোকদের পাপ ক্ষমা করাইবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার মৃত্যু অপমৃত্যু ছিল না।

এস্থলেও ইসলাম ইহুদ-নাছারাদের মিথ্যা প্রচারণাকে পণ্ড করিয়াছে এবং বাস্তব ঘটনা প্রকাশ পূর্বক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বাস্তব ঘটনা এই যে, কস্মিনকালেও হযরত ঈসা (আঃ) ইহুদীদের হস্তে শূলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন নাই।

ঈসা (আঃ) ইহুদীদের হস্তে শূলিবিদ্ধরূপে নিহত না হইয়া তাঁহার সর্বশেষ অবস্থা কি হইয়াছিল, সে সম্পর্কে সরাসরি পবিত্র কোরআনের ঘোষণা লক্ষ্য করুন।

وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ـ مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ـ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ـ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ـ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

(ইহুদীরা যেসব কারণে অভিশপ্ত ও গজবে পতিত হইয়াছিল ঐ সবের মধ্যে একটি অন্যতম কারণ ইহাও ছিল যে,) তাহারা মিথ্যা দাবী করিত– আমরা মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করিয়াছি; যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তাহারা তাঁহাকে (কোন প্রকারে) হত্যা করিতেও পারে নাই এবং শূলিবিদ্ধও করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ তাহারা এই ব্যাপার গোলক-ধাঁধায় পতিত ছিল। নিশ্চয় যাহারা এই ব্যাপারে ভিন্ন মত (তথা হত্যা বা শূলিবিদ্ধ করার মত) পোষণকারী হইয়াছে তাহারা এই ব্যাপারে শুধু একটা সন্দেহের মধ্যে আছে– শুধুমাত্র ধারণা ও অনুমানের উপর চলিয়াছে; এই ব্যাপারে তাহাদের নিকট সত্য এবং বাস্তবের কোন জ্ঞান মোটেই নাই। অকাট্য ও নির্ভুল খবর ইহাই যে, তাহারা ঈসাকে হত্যা করিতে পারে নাই, বরং আল্লাহ তাঁহাকে নিজের প্রতি* উঠাইয়া নিয়াছিলেন। আল্লাহ ত সর্বশক্তিমান অতিশয় হেকমতওয়ালা সুকৌশলী।

(পারা– ৬, রুকু– ২)

উল্লিখিত বিবৃতির বিবরণে একদল ঐতিহাসিক তফছীরকারের মত এই যে, ইহুদীরা হযরত ঈসার বিরুদ্ধে তৌরাতকে লংঘন করা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করার অভিযোগ আনয়ন করিল। এইরূপে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উভয় অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রাণদন্ডের আদেশ রাজশক্তির তরফ হইতে জারি করাইল এবং তথাকার তৎকালীন রীতি অনুযায়ী শূলিবিদ্ধ করিয়া প্রাণদন্ড দানের জন্য ইহুদীরা হযরত ঈসাকে গ্রেফতার ও বন্দী করিয়া শূলে চড়াইবার মনস্ত করিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ তাঁহাকে বাঁচাইয়া নিলেন, শত্রুরা অপর একটি লোককে ঈসা মনে করিয়া তাহাকে শূলিবিদ্ধ করিয়া মারিল।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও তফছীরকারগণের মতে ঘটনা এই যে, ঈসা (আঃ) যখন ইহুদীদের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রে স্বীয় জীবন সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়িলেন– তখন তিনি তাঁহার বিশেষ ছাহাবী বা শিষ্য–হাওয়ারীগণকে আবদ্ধ ঘরে একত্রিত করিয়া তাঁহার পরেও আল্লাহর দ্বীনকে জারি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যাইতে বিশেষরূপে উদ্বুদ্ধ করিলেন, যাহার ইঙ্গিত পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে।–

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ ..... ـ

ঈসা (আঃ) যখন ইহুদীদের তরফ হইতে পূর্ণ বিদোহীতা অনুভব করিলেসন, এমনকি স্বীয় জীবন হইতেও নিরাশ হইয়া পড়িলেন) তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আমার সাহায্যকারী কে আছে?

---

* আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে নিজের প্রতি উঠাইয়া নিয়াছেন; "আল্লাহর প্রতি" বলিতে "উর্ধ্ব জগত বা আসমান" উদ্দেশ্য। প্রত্যেক ভাষায়ই এই ধরনের ব্যবহার আছে। মক্কা শহরে কা'বা ঘরে আল্লাহ তায়ালা অবস্থান করেন না, কিন্তু মক্কা নগরীকে بلد الله আল্লাহর শহর; কা'বাকে بيت الله আল্লার ঘর" বলা হয়। যেহেতু ঐ ঘরটি এবং উহার মাধ্যমে ঐ শহরটির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে।

তদ্রূপ উর্ধ্ব জগতেই আল্লাহ তায়ালার সেরা সৃষ্টি এবং বিশাল কুদরতের করখানা সমূহের সমাবেশ। সেখানেই মহান আরশ, কুরছী, লাওহে-মাহফুজ, ছেদরাতুল-মোন্‌তাহা বিদ্যমান। সেখানেই আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট জগতের পরিচালক বাহিনী ফেরেশতা জাতির অবস্থান; তথা হইতেই বিশ্ব জগতের পরিচালন কার্যবিধি সরবরাহ করা হয়– এই সূত্রেই কা'বাকে আল্লাহর ঘর বলার ন্যায় উর্ধ্ব জগতের দিকে আল্লাহর দিক বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

হাওয়ারীগণ উত্তর করিল, "আমরা সকলেই আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারীরূপে প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।"

ঈসা (আঃ) আবদ্ধ ঘরে শিষ্যগণকে লইয়া কথোপকথনে রত ছিলেন এই সুযোগে তাঁহার প্রাণঘাতীরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল এবং ঘরটিকে ঘেরাও করিয়া তাহাদের একজন প্রথম ঐ ঘরে প্রবেশ করিল। তখন আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরত বলে হযরত ঈসাকে তথা হইতে সরাইয়া নিলেন এবং ঐ ঘরে প্রবেশকারী লোকটির উপর বা অন্য কোন একজনের উপর হযরত ঈসার আকৃতির ছায়া পড়িয়া গেল। যে ব্যক্তির উপর হযরত ঈসার রূপ পড়িয়াছিল শত্রুরা তাহাকেই ঈসা মনে করিয়া শূলদন্ড দিল।

ইহুদীরা হযরত ঈসাকে গ্রেফতার ও বন্দী করিতে পারিয়াছিল এই মতবাদ পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। পবিত্র কোরআনের বিবৃতি এই–

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ - وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ - اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -

শত্রুদল ঈসাকে মারিয়া ফেলার গোপন ব্যবস্থা আঁটিল, আল্লাহ তাঁহাকে রক্ষা করার গোপন ব্যবস্থা করিলেন এবং আল্লাহ হইলেন সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক। আল্লাহ (ঈসা (আঃ) কে শত্রুদের হইতে অভয় দানে) বলিয়াছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে পুরাপুরি (অর্থাৎ তোমার আত্মা ও দেহের সমষ্টি ভূপৃষ্ঠ হইতে) লইয়া যাইব * এবং আমার প্রতি উঠাইয়া নিব এবং তোমাকে পাক-পবিত্র রাখিব তোমার অমান্যকারীদের হাত হইতে। (পারা–৩, রুকু– ১৪)

উক্ত বিবরণের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শত্রুদলের নাপাক হাত হযরত ঈসাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার গোপন ব্যবস্থার এবং তাঁহার সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক হওয়ার স্বার্থকতা ও এই দাবী করে যে, ইহুদী শত্রুদলের স্পর্শন হইতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত ছিলেন।

ইতিহাস ভান্ডারে নজর করিলে অনেক অনেক ঘটনাই এইরূপ পাওয়া যায় যাহার বিস্তারিত তফছীল বর্ণনায় ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত থাকে। সেই মতভেদ দেখিয়া মূল ঘটনাকে অস্বীকার করা বোকামী বৈ কি হইতে পারে?

আলোচ্য বিষয়টিও তদ্রূপ; উহার বিস্তারিত তফছীল রূপায়নের ঐতিহাসিক ও তফছীরকারগণের বিভিন্ন মত আছে; সেই বিভিন্নতার ছুতা ধরিয়া মূল ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না যাহা পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা যে وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "ইহুদীরা ঈসাকে হত্যা করিতে পারে নাই, শূলিবিদ্ধও করিতে পারে নাই, বস্তুতঃ তাহারা গোলক-ধাঁধায় পড়িয়াছিল।"

* متوفيك শব্দের তফছীর কেহ কেহ এইরূপও করিয়াছেন যে, আমি তোমাকে মৃত্যু দান করিব, অর্থাৎ শত্রুদল তোমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহারা তা করিতে সক্ষম হইবে না। কারণ, নির্ধারিত সময়ে স্বাভাবিকরূপে তোমার মৃত্যু ঘটাইব আমি; শত্রুদল সেই সময়ের পূর্বেই তোমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে, কিন্তু সেই প্রয়াস তাহারা পাইবে না। হযরত ঈসার স্বাভাবিক মৃত্যুর নির্ধারিত সময় হইল কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূপৃষ্ঠে তাঁহার অবতরণের দীর্ঘকাল পর– যাহার বিস্তারিত বিবরণ অনেক অনেক হাদীছে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা متوفيك শব্দের যে তফছীর করিলাম তাহার বিস্তারিত বিবরণ ও দলিল প্রমাণ সম্মুখে "প্রশ্ন ও উত্তর" আলোচনায় দেখিতে পাইবেন।

ইসলাম হযরত ঈসার মর্যাদাকে কত নির্মলরূপে প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছে! পক্ষান্তরে খৃস্টান জাতি হযরত ঈসাকে একদিকে খোদা বা খোদার বেটা পর্যন্ত পৌছাইয়াছে, অপরদিকে এতদূর নিম্নস্তরে ফেলিয়াছে যে, তাহারা বলে, ইহুদীরা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিল, তাঁহার গায়ে থু থু দিয়াছিল, তাঁহাকে মারপিট করিয়াছিল, তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়াছিল,তাঁহার মাথায় কাঁটার টোপ পরাইয়া তাঁহাকে শূলে চড়াইয়াছিল এবং তিনি চিৎকার করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ভ্রষ্ট খৃষ্টানদের এই সব আকীদা সম্পর্কে তাহাদের গর্হিত বাইবেলের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করুন– "আর যে লোকেরা যীশুকে ধরিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ ও প্রহার করিতে লাগিল" (বাইবেল– লুক ১৫১)। "যীশুকে ক্রুশে দিবার পর সেনারা তাঁহার বস্ত্র সকল লইয়া চারি অংশ করিয়া প্রত্যেক সেনাকে এক এক অংশ দিল।" (বাইবেল– যোহন ১৯৯) "এবং কাটার মুকুট গাথিয়া তাঁহার মাথায় দিল, আর তাঁহার মস্তকে নল দ্বারা আঘাত করিল, তাঁহার গায়ে থু থু দিল" (বাইবেল-মার্ক ৯২) "আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চঃস্বরে চীকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, "এলী লামা শবক্তানী" অর্থাৎ ঈশ্বর আমার! তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?" (বাইবেল– মথি ৫৬)।

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসাকে ইহুদীদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; কি ব্যবস্থায় রক্ষা করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে এবং হযরত ঈসার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে ইসলামের সোনালী যুগ ইহতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী প্রত্যেক যুগের কোরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত ও আকীদা এই যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয় কুদরত বলে হযরত ঈসাকে সশরীরে, জীবতাবস্থায় ভূপৃষ্ঠ হইতে আসমানে উঠাইয়া নিয়াছিলেন এবং তিনি তথায় অবস্থান রত আছেন। কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শরীয়তের অওতাভুক্তরূপে আসমান হইতে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন এবং সুদীর্ঘ কাল ভূপৃষ্ঠে অবস্থানের পর তাঁহার সাধারণ ও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে এবং তিনি সাধারণ রীতি অনুসারে পবিত্র মদিনার ভূমিতে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজা সংলগ্ন স্থানে সমাহিত হইবেন। এই মতবাদ ও আকীদার প্রতিটি অংশের দলিল প্রমাণ লক্ষ্য করুন–

হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া লওয়া প্রসঙ্গ

পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভকারী ছাহাবীগণের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক যুগের ইমাম-মোজতাহেদ, কোরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের আকীদা ইহাই যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ) কে সশরীরে জীবতাবস্থায় আসমানে উঠাইয়া নিয়াছেন।* এই বিষয়ে সকলের একমত হওয়াকেই তফছীরকারগণ হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার দলিল স্বরূপ "ছলফে-ছালেহীনের এজ্‌মা" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। "ছলফে-ছালেহীন" অর্থ পূর্ববর্তী সৎ সাধু নির্ভরযোগ্য ওলামা-মাশায়েখ ইসলাম বিশেষজ্ঞগণ, আর "এজ্‌মা" অর্থ ঐক্যমতপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

এতদ্ভিন্ন এই বিষয়ের আর একটি দলিল হইল পূর্বালোচিত পারা– ৬, রুকু– ১ সূরা নেছার আয়াত। ঐ আয়াতের একটি বাক্য বিশেষ লক্ষ্যণীয়–وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه "ইহা একটি বাস্তব, অকাট্য ও নির্ভুল তথ্য যে, ইহুদীগণ হযরত ঈসাকে হত্যা করিতে সমর্থ হয় নাই, বরং আল্লাহ ঈসাকে নিজের

* বহু সমালোচিত পন্ডিত তফছীরকার যিনি কোন নবীর পক্ষে মো'জেযা তথা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা স্বীকার করিতে রাজী ছিলেন না, এস্থলে দেখা যায় তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পক্ষেও কোন অস্বাভাবিক ঘটনা স্বীকার করিয়া নিতে রাজি নহেন।

এস্থলে পন্ডিত মিয়া হযরত ঈসাকে জীবন্ত আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করতঃ ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, হযরত ঈসার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এ সম্পর্কে পাঠকবর্গের সম্মুখে একটি বিষয় না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। হযরত ঈসার যুগ হইল ইতিহাসের যুগ, এখন হইতে মাত্র দুই হাজার বৎসরেরও কম অতীতের যুগ। যেখানে দেড় হাজার বৎসর পূর্বের নবী হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সমাধিস্থল এবং উহার শহর পবিত্র মদীনা এত জাকজমকপূর্ণরূপে বিদ্যমান সেখানে দুই হাজার বৎসর পূর্বের নবী হযরত ঈসা আলাইহিছ্ছালামের সমাধিস্থলের কোন খোঁজ ইতিহাসে পাওয়া না যাওয়া আশ্চর্যজনক নয় কি? বিশেষতঃ হযরত ঈসার উম্মত হওয়ার দাবীদার বর্তমান বৃহৎ ও উন্নত জাতি খৃষ্টানগণের সকল রকম সুযোগ ও সামর্থ থাকা সত্বেও তাহাদের নবীর সমাধি স্থলের কোন নাম-নিশানা বাস্তবে বা ইতিহাসে বিদ্যমান না থাকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নয় কি?

চতুর পন্ডিত সাহেব যিনি নিজকে ইতিহাস ও ভূগোলের বড় একজন অভিজ্ঞ মনে করিয়া থাকেন তিনি মাত্র দুই হাজার বৎসর পূর্বের একজন মহা মানবের এত বড় একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নিলেন, অথচ ভৌগলিক বা ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ পেশ করিলেন না– ইহা তাহার পক্ষে কলঙ্কের বিষয় হওয়া সত্বেও সেই দিকে তিনি অগ্রসর হন নাই। কারণ, ভূগোল ও ইতিহাস ক্ষেত্রে কোন মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা হইলে তাহা সহজেই লোক চোখে ধরা পড়িয়া যাইবে, তাই এ ধরনের বিষয়ের সহজ ও সরল প্রমাণ ইতিহাস ও ভূগোলকে বাদ দিয়া তিনি বলিয়াছেন, পাঠকগণকে অতি সংক্ষেপে এইটুকু জানাইয়া রাখিতেছি যে, বিভিন্ন বিশিষ্ট আলেম ও ইমামের সমর্থন আমার পক্ষে আছে।" অতপর পন্ডিত সাহেব চার জনের মতামতের উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন। তন্মেধ্যে তিন জনের বক্তব্যই পন্ডিত সাহেবের মূল দাবীর সহিত সঙ্গতিবিহীন। সেই তিন জন হইলেন (১) ইবনে হাজম, (২) ছাহাবী ইবনে আব্বাছ, (৩) শাহ অলিউল্লাহ। স্বয়ং পন্ডিত সাহেব এই তিন জনের বক্তব্যের যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহাতেই দেখা যায় যে; তাঁহারা আলোচ্য বিষয় তথা হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে কিনা সে সম্পর্কে কিছু বলেন নাই, বরং পবিত্র কোরআনে হযরত ঈসার ঘটনায় এক স্থানে انى متوفيك এবং আর এক স্থানে কেয়ামতের দিনে হযরত ঈসার একটি উক্তির বিবরণ দানে توفيتنى শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত শব্দদ্বয়ের তফছীর সম্পর্কে তফছীরকারদের বিভিন্ন মত আছে; একদল তফছীরকার

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রতি উঠাইয়া নিয়াছিলেন" হযরত ঈসাকে হত্যা করার দাবীর প্রতিকূলে আল্লাহ কর্তৃক উঠাইয়া নেওয়ার ঘোষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এই সম্পর্কে তৃতীয় দলিল হইল কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসার ভূপৃষ্ঠে অবতরণ। সে সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন, সম্মুখে উহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইবে। এ স্থলে একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, ভূপৃষ্ঠে হযরত ঈসার অবতরণ সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে এবং হাদীছের মধ্যেই ينزل শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা نزول শব্দ হইতে গৃহীত এবং উহার একমাত্র অর্থ অবতরণ করা, সুতরাং যদি বলা হয় যে, হযরত ঈসার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে তাঁহাকে ইহজগতে পুনঃ জীবিত করিয়া উঠান হইবে; ইহাও উক্ত হাদীছ সমূহের পরিপন্থী হইবে। কারণ, মৃতকে জীবিত করিয়া উঠান হইলে সে ক্ষেত্রে "অবতরণ করিবেন" বলা যায় না।

এতদ্ভিন্ন হযরত ঈসার আসমান হইতে অবতরণের যে বিবরণ হাদীছে বর্ণিত আছে উহা যাহা সম্মুখে আসিতেছে– দৃষ্টে পুনর্জীবিত হইয়া আসার সম্ভাব্যতার কোন অবকাশ নাই।

এই বিষয়ের চতুর্থ দলীল একটি সুস্পষ্ট হাদীছ। (১) তফসীর ইবনে কাছীর। (২) তফছীর রুহুল মায়ানী (৩) তফছীর ইবনে জরীর কেতাবে উহা উল্লেখ আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْيَهُوْدِ اِنَّ عِيْسٰى لَمْ يَمُتْ وَاِنَّهُ رَاجِعٌ اِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ -

অর্থ ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) একদা ইহুদীদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় জানিও, ঈসার মৃত্যু হয় নাই এবং তিনি কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তোমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিবেন।

যাঁহাদের মধ্যে উল্লেখিত তিনজনও আছেন তাঁহাদের মত এই যে, প্রথম শব্দটির মর্ম এই যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে খবর দিয়াছিলেন যে, "আপনাকে মৃত্যু দান করিব আমি" এবং দ্বিতীয় শব্দটির মর্ম এই যে, হযরত ঈসা তাঁহার কেয়ামতের দিনের বক্তব্যে বলিবেন, "হে পরওয়ারদেগার আপনি যখন আমাকে মৃত্যু দান করিয়াছিলেন।"

পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত স্থানদ্বয়ের তফছীর সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। তন্মধ্যে সিদ্ধ ও সঠিক পরিগণিত তফছীরের বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে "প্রশ্ন ও উত্তর" আলোচনায় আসিবে, কিন্তু উপরোল্লিখিত তফছীরকার দলের মত অনুসারেও হযরত ঈসার আবির্ভাব কালেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে এই সিদ্ধান্ত উক্ত আয়াতদ্বয়ের তাৎপর্য্য কিছুতেই নহে– ইহা অবধারিত।

কিয়ামত নিকটবর্তীকালে হযরত ঈসা আসমান হইতে প্রকাশ্যে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন এবং সুদীর্ঘকাল ভূপৃষ্ঠে ঘর-সংসারির সহিত অতিবাহিত করিয়া স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করিবেন, যাহা পূর্বাপর সমস্ত মুসলমানদের ঐক্যমতপূর্ণ আকীদা ও বিশ্বাস। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের তফছীরে যাহাদের মতে মৃত্যু উদ্দেশ্য করা হইয়া থাকে উহা হযরত ঈসার এই কেয়ামত নিকটবর্তীকালীন স্বাভাবিক মৃত্যুই, অন্যকোন মৃত্যু নহে। এই দাবীর সমর্থনে সংক্ষেপে কতিপয় তথ্য পেশ করিতেছি–

متوفيك ورافعك يعنى رافعك ثم متوفيك فى اخر الزمان -

"ইবনে আব্বাসের মতে متوفيك ورافعك আয়াতের অর্থ এই যে, আপনাকে মৃত্যু দান করিব আমি। এখন আপনাকে উঠাইয়া নিব এবং পরে পৃথিবীর সর্বশেষ যুগে আমি আপনার মৃত্যু ঘটাইব।" (তফছীর দোর্‌রে মনছুরঃ ২–৩৬)। এতদ্ভিন্ন ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়া সম্পর্কে স্বীয় আকীদা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে–

ليقتلوه فادخله جبرئيل عليه السلام بيتا ورفعه الى السماء ولم يشعروا بذلك

"ইহুদীগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত ঈসাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল, সেমতে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করার পরিকল্পনা লইয়া রওয়ানা হইল। জিব্রাইল (আঃ) হযরত ঈসাকে একটি ঘরে প্রবেশ করাইলেন এবং তথা হইতে তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া নিলেন, ইহুদীরা এই সম্পর্কে টেরও পাইল না (রুহুল মায়ানী ৬–১০) অন্য এক স্থানে আরও আছে–

رفعه من غير وفاة ولا نوم وهو الرواية الصحيحة عن ابن عباس -

"আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে মৃত্যু বা নিদ্রা ব্যতিরেকে উঠাইয়া নিয়াছিলেন– ইহাই ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে ছহীহ রেওয়ায়াতে প্রমাণিত রহিয়াছে" (রহুল মায়ামী ৩–১৭৯)।

শাহ অলীউল্লাহর متوفيك শব্দের তফসীরে ইবনে আব্বাসের মতই অবলম্বন করিয়াছেন।

পন্ডিত সাহেব তাহার একজন সমর্থক বানাইয়াছেন ইমাম ইবনে হজমকে। আমরা ঐ ইমাম ইবনে হাজম হইতে তাঁহার ঐ কেতাব হইতেই যে কিতাবের নাম পন্ডিত সহেব উল্লেখ করিয়াছেন, একটি উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি। ইবনে হাজম নবীগণ সম্পর্কে মুসলমানদের জন্য প্রয়োজনীয় ঈমান ও আকীদার বিবরণ দিতে যাইয়া বলেন–

ان عيسى سينزل ... برهان ذلك ما حدثنا عبد الله .... قال جابر سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول لاتزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول اميرهم -

সাধারণ প্রশ্ন ও উহার উত্তর

বিজ্ঞান মতে মহাশূন্য বা ঊর্ধ্ব জগতের যে অবস্থা ও স্তরসমূহ আবিষ্কার হইয়াছে উহা দৃষ্টে রক্ত-মাংসে গঠিত দেহবিশিষ্ট জীবের ঊর্ধ্বে যাওয়া সম্ভবই নহে।

বিজ্ঞানই এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ করিয়া দিয়াছে। বর্তমানে বিজ্ঞান কলা কৌশলের মাধ্যমে ঊর্ধ্ব জগতের দিকে– যেমন, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের দিকে মানুষ প্রেরণে সক্ষম হইয়াছে। সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা আদি হইতেই বিশেষ কলা-কৌশলের মাধ্যমে বা উহা ব্যতিরেকেও উক্ত কার্য সমাধা করিতে সক্ষম– ইহাতে দ্বিধাবোধের কারণ কি থাকিতে পারে?

আরও একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, মানব-দেহবিশিষ্ট হযরত ঈসা যদি আসমানে সাধারণ জীবনে জীবিত থাকেন তবে তথায় তাঁহার পানাহার ইত্যাদির অনেক অনেক আবশ্যকাদি পূরণের সমস্যারই বা সমাধান কি?

এই প্রশ্নের উত্তরও সহজ। প্রাণী যে স্থানে অবস্থান করে তথাকার উপযোগী অবস্থাই তাহার সম্মুখে আসে এবং মহান প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তায়ালা তথায়ই তাহার সকল সমস্যার সমাধান যোগাইয়া থাকেন। ভূ-পৃষ্ঠোর সমস্যাদি ভিন্ন। ভূগর্ভের সমস্যাদি ভিন্ন, সমুদ্র তলের সমস্যাদি ভিন্ন, চন্দ্রলোকে জীবের অস্তিত্ব থাকিলে উহার সমস্যাদি ভিন্ন, ইসলামী আকীদা মতে আকাশ জগতে ফেরেশতাদের অবস্থান রহিয়াছে। ঈসা (আঃ) তথায় পৌঁছিয়া ফেরেশতাদের অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়া থাকিলে তাহাতে বৈচিত্রের কি আছে!

"নিশ্চয় মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা (আঃ) অচিরেই অবতরণ করিবেন; ইহার প্রমাণ ঐ হাদীছ যে, হাদীছখানা ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি– নবী (সঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের একটি দল কেয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত প্রাবল্যের সহিত হক্ক ও সত্যের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। নবী (সঃ) বলেন, অতপর মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা (আঃ) অবতরণ করিবেন, তখন মুসলমানদের উপস্থিত নেতা হযরত ঈসাকে (নামাযের) ইমামতি করিতে বলিবেন। হযরত ঈসা অসম্মতি জ্ঞাপনে বলিবেন, এই উম্মত তথা উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ সম্মান এই যে, আপনারা নিজেই নিজেদের ইমামতী করিবেন।" (মোহাল্লা ১-৯)

পাঠকবর্গ! উক্ত উদ্ধৃতি দৃষ্টে ইহা কি বলা সম্ভব যে, ইমাম ইবনে হাজমের মতে হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে? তা' হইলে ينزل অবতরণ করিবেন" এবং তাঁহাকে ইমামতির জন্য আহবান করা হইবে– এই সবের তাৎপর্য ও সঙ্গতি কি হইবে?

ইমাম মালেকও সকলের সঙ্গে একমত যে, হযরত ঈসা কেয়ামতের নিকটবর্তী কালে ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন। মোসলেম শরীফের শরাহ– একমালু-একমালেল মোলেম নামক কেতাবে উল্লেখ আছে

قال مالك بينا الناس قيام يستمعون لاقامة الصلوة فتغشاهم غمامة فاذا عيسى قد نزل .

"ইমাম মালেক বলিয়াছেন, লোকগণ নামাযের একামত শ্রবণে দাঁড়ানো থাকা মুহূর্তে তাহাদের উপর এক খন্ড মেঘমালা আসিবে এবং তাহারা দেখিবে, ঈসা (আঃ) অবতরণ করিয়াছেন" (১-২২৬)।

পণ্ডিত মিয়া ইমাম মালেক হইতে হযরত ঈসার মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পক্ষে একটি উদ্বৃতি দিয়াছেন যে, ইমাম মালেক হযরত ঈসা সম্পর্কীয় একটি আয়াতের তফছীরে مات শব্দ বলিয়াছেন।

পাঠকবৃন্দ ইহা জানিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, পণ্ডিত সাহেব যেই কিতাব হইতে ইমাম মালেকের অভিমতটি আমদানী করিয়াছেন সেই কিতাবেই উক্ত অভিমতের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বাক্য রহিয়াছে, যাহা পন্ডিত সাহেব দেখিয়াও দেখেন নাই। স্বয়ং পন্ডিত সাহেব উক্ত অভিমতটি যাঁহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন– 'হাদীছের বিখ্যাত অভিধানকার মোল্লা মুহাম্মদ তাহের" তিনিই উক্ত অভিমত ব্যক্ত করার সাথে উল্লিখিত তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে

ولعله اراد رفعه الى السماء .... لتواتر خبر النزول .

অর্থ ঃ হযরত ঈসার ভূপৃষ্ঠে অবতরণ বিষয়টি যেহেতু অকাট্যরূপে অনেক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, তাই মনে হয় ইমাম মালেক مات শব্দ বলিয়া হযরত ঈসাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়াই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। (মাজমাউল বেহার ১-২৮৬)

ইমাম মালেকের অভিমতের এই ব্যাখ্যাই সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা, কারণ ইহজগৎ ত্যাগ করাকে مات বলা হয়; হযরত ঈসা যখন আসমানে চলিয়া গিয়াছেন তখন তিনি অবশ্যই ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন। পন্ডিত সাহেবের উদ্ধৃতি মারফৎই ইমাম মালেকের উক্তির বিবরণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তিনি স্বীয় উক্তিতে ঘটনার সময় হযরত ঈসার বয়সের পরিমাণটা নির্ধারিত করার উদ্দেশ্যটাই বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়াছেন যে, তখন তাঁহার বয়স ৩৩ বৎসর ছিল। মৃত্যুর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। ইমাম মালেকের অভিমতের সঙ্গতি রাক্ষার্থে এই ব্যাক্যারও উল্লেখ হইয়াছে যে, তাঁহার মতে হয়ত ঈসা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পুনর্জীবিত হইবেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না, কারণ ইহা ينزل ইয়ানযিল" শব্দের পরিপন্থী; ينزل অর্থ অবতরণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন অবতরণ সম্পর্কে ইমাম মালেক স্বয়ং যে বিবৃতি দান করিয়াছেন উহারও পরিপন্থী।

বিজ্ঞান ও যুক্তি ইত্যাদির হাতড়ানিতে যত প্রশ্নেই উদয় হউক, পবিত্র কোরআন ঘটনা বর্ণনার সমাপ্তিতে এমন একটি বাক্য উল্লেখ করিয়াছে যদ্দ্বারা সকল প্রশ্নেরই অবসান হইয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন–

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

"আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আঃ)-কে নিজের কাছে উঠাইয়া নিয়াছেন; আল্লাহ ত সর্বশক্তিমান, হেকমতওয়ালা সুকৌশলী আছেনই।"

এস্থলে ঈসা (আঃ)-কে আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার ক্রিয়াপদের কর্তাপদ আল্লাহ তায়ালা নিজকে ব্যক্ত করিয়া عزيز (আজীজ) "সর্বশক্তিমান", حكيم (হাকীম) "হেকমত ওয়ালা সুকৌশলী" –আল্লাহতায়ালার এই দুইটি ছেফত বা গুণকে সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করিয়া দেওয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

* হযরত ইসার মৃত্যু হয় নাই, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আসমানে জীবন্ত উঠাইয়া নিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে কুচক্রিরা পবিত্র কোরআনের দুইটি শব্দের দ্বারা প্রবঞ্চনার প্রয়াস পায়। একটি متوفيك যাহার পূর্ণ আয়াতটি হইল–

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ـ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ

متوفى শব্দটি توفى হইতে গৃহীত। যাহা মৃত্যু দান করা অর্থে স্থান বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সূত্রেই বিভ্রান্তকারীগণ বলে যে, হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, توفى "তাওয়াফ্ফি" শব্দটি শুধুমাত্র উপ-অর্থ হিসাবে স্থান বিশেষে মৃত্যু দান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কিন্তু এই শব্দটির আসল অর্থ হইল, "কোন বস্তুকে পুরাপুরি নিয়া নেওয়া।" যেমন এই ধাতু হইতেই গৃহীত ايفاء শব্দের অর্থ "পুরাপুরি দিয়ে দেওয়া"।

আরবী শব্দের আসল অর্থ ও উপ-অর্থের পৃথককারী অভিধান اساس البلاغة "আছাছুল বালাগাহ্" হইতে একটি উদ্ধৃতি পাঠক সমক্ষে পেশ করিতেছি––

استوفاه وتوفاه ـ استكمله ..... ومن المجاز توفاه الله ـ

অর্থাৎ "তাওফ্ফা" অর্থ কোন বস্তুকে পুরোপুরি নিয়ে নেওয়া, আর উপ-অর্থ হিসাবে "আল্লাহ মৃত্যু দান করিয়াছেন" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (৫০৫ পৃঃ)

উল্লিখিত আয়াতে "তাওফ্ফা" হইতে গৃহীত "মৃতাওয়াফ্ফী" শব্দের আসল অর্থ ছাড়িয়া উপ-অর্থ লওয়ার প্রয়োজন মোটেই নাই। সুতরাং আসল অর্থই লইতে হইবে এবং এই সূত্রে আয়াতটি মুসলমানদের সর্বসম্মত আকীদারই প্রতিধ্বনি। আয়াতের অর্থ এই–

ইহুদিরা (হযরত ঈসাকে হত্যা করার) গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিল; পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা (তাঁহাকে রক্ষা করার) গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর আল্লাহ হইলেন সর্বাধিক উত্তম ব্যবস্থাকারী। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ (ঈসাকে সান্ত্বনা দানে) বলিয়াছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে পুরাপুরি (তোমার দেহ ও আত্মার সমষ্টি) নিয়া নিব– তোমাকে আমার প্রতি উঠাইয়া নিব এবং (ইহুদীদের নাপাক হাত হইতে) তোমাকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র রাখিব।"

আলাচ্য আয়াতের উক্ত তফছীরের যথার্থতা প্রমাণে কতিপয় তথ্য–

(১) এই তফসীর উক্ত আয়াতের পূর্বাপর বিবরণী ও বিন্যস্ততায় শুধু সামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, উহার রক্ষা-কবচও বটে। কারণ বিষয়বস্তুর বিবরণীর আরম্ভে বলা হইয়াছে "ইহুদীরা ঈসাকে মারিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং আল্লাহও তঁহাকে রক্ষা করিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আর আল্লাহ হইলেন সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক"– এই ভূমিকার পরেই বলা হইয়াছে, আল্লাহ ঈসাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন যে, انى متوفيك ورافعك الى এখন এই বাক্যের মর্ম যদি এই হয় যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে বলিলেনঃ

"রহস্যজনকরূপে অস্বাভাবিকভাবে আমি আপনাকে পুরাপুরি তথা আপনার দেহ ও আত্মার সমষ্টি জগৎবাসীর নিকট হইতে লইয়া যাইব এবং আমার প্রতি উঠাইয়া লইব," তবেই মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার গোপন ব্যবস্থার একটা ভাল নজীর রূপায়িত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার যে সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক উহারও একটা উপযুক্ত নিদর্শন স্থাপিত হয়। পক্ষান্তরে যদি উক্ত বাক্যের মর্ম এই হয় যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসাকে বলিলেন, "আমি আপনাকে মৃত্যু দিব এবং আপনার মর্যাদা বাড়াইব, তবে মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার গোপন ব্যবস্থার কোন যথার্থতা দেখা যায় না এবং "আল্লাহ সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক" বাক্যটি প্রহসনে পরিণত হয়, কারণ ইহুদীরা হযরত ঈসাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল এবং উহার জন্য কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। তখন যদি হযরত ঈসার মৃত্যু হইয়া গিয়া থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালার কৌশল ও গোপান ব্যবস্থার সাফল্য কি হইবে? এবং আল্লাহ তায়ালা সুকৌশলী তথা সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক হওয়ার যথার্থতা কি হইবে? সুতরাং এখানে 'মুত্যু দান" অর্থ মোটেই হইতে পারে না।

(২) এই তফছীরে متوفيك এবং رافعك উভয় শব্দের আসল অর্থ "পুরাপুরি নিয়া নেওয়া এবং উঠাইয়া নেওয়া" ধরা হইয়াছে। মৃত্যুদন্ড ও মর্যাদা বাড়ান অর্থ হইলে উপঅর্থের ছড়াছড়ি হইবে যাহা সুসাহিত্যিকতার পরিপন্থী।

(৩) আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসার সর্বশেষ খবর সম্পর্কে যে চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট ঘোষণা (সূরা নেছা,পারা-৬, রুকু-২ তে) প্রদান করিয়াছেন- وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه "নির্ভূল বাস্তব একিনী খবর এই যে, ইহুদীরা ঈসাকে হত্যা করিতে পারে নাই, বরং আল্লাহ তাঁহাকে নিজের প্রতি উঠাইয়া নিয়াছেন।" আমাদের তফছীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতের মর্ম উক্ত ঘোষণার পূর্ণ মোতাবেক হয়। পক্ষান্তরে متوفيك অর্থ "মৃত্যুদান" ধরা হইলে আয়াতের মর্ম উক্ত ঘোষণাটির পরিপন্থী হইয়া পড়ে।

উক্ত আয়াতে رفع "রাফাআ" শব্দের অর্থ "উঠাইয়া নেওয়া" লইয়া "মর্যাদা বাড়াইয়া দেওয়া" ধরা হইলে শব্দের আসল অর্থ গ্রহণের সরল পথ পরিত্যাগ ও উপ অর্থের বিড়ম্বনা ছাড়া بل বরং" প্রতিকূল বোধক শব্দটির তাৎপর্য পঙ্গু হইয়া যাইবে। 'হত্য করিতে পার নাই, বরং উঠাইয়া নিয়াছেন' এই 'বরং' শব্দের তাৎপর্যে হেরফের করিলে তাহা অহেতুক হইবে।

(৪) সুপ্রসিদ্ধ তফছীরকার আবু জাফর ইবনে জরির তাবারী (রঃ) স্বীয় তফছীরে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্তরূপে বলেন-

واولى هذه الاقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك انى قابضك الى .

"বিভিন্ন তফছীরের মধ্যে সিদ্ধ ও সঠিক তফসীর আমাদের মতে এই- আমি আপনাকে ভূপৃষ্ঠ হইতে লইয়া যাইব এবং উঠাইয়া নিব" (তফসীর ইবনে জারীর ৩-১৮৪)

মূল বিষয়ে বিতর্কমূলক দ্বিতীয় শব্দটি توفيتنى এই শব্দটি সম্পর্কে বক্তব্য উহাই যাহা প্রথম শব্দটি সম্পর্কে ছিল, উভয় শব্দ একই ধাতু হইতে গৃহীত। পূর্ণ আয়াতটি হইল এই

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ .

আয়াতের সিদ্ধ ও সঠিক অর্থ "(হযরত ঈসা হাশরের ময়দানে বলিবেন, হে আল্লাহ!) যখন আপনি আমাকে ভূপৃষ্ঠ হইতে পুরাপুরি (আত্মা ও দেহের সমষ্টি) লইয়া আসিয়াছিলেন তখন হইতে আপনিই লোকদের অবস্থার পর্যবেক্ষণকারী ছিলেন। আয়াতটির ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

আসমান হইতে হযরত ঈসার অবতরণ

ইমাম বোখারী (রঃ) এই বিষয়বস্তুটিকে মূল পরিচ্ছেদরূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বিশেষ গুরুত্বের সহিত এই পরিচ্ছেদে উহাই প্রমাণিত করিতেছেন যাহা পূর্বাপর বিশ্ব মুসলিমের সর্বসম্মত আকীদাহ্ যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঈসা (আঃ) প্রকাশ্যে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন। মূল বিষয়টির প্রমাণে التصريح بما تواتر فى نزول المسيح নামক পুস্তিকায় ৭৩টি হাদীছের সমাবেশ করা হইয়াছে। এই

কারণে উক্ত আকীদা ও বিশ্বাসকে ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গরূপে গণ্য করা হইয়াছে এবং এই আকীদার পরিপন্থী মতকে ইসলাম বিরোধী, এমনকি কুফরী নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

কোন কোন হাদীছে হযরত ঈসার অবতরণ প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে কতিপয় বিবরণের উদ্বৃতি প্রদান করা হইল–

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيْحَ بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَاْطَاَ رَاْسَهٗ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهٗ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ .....

দজ্জাল-আন্দোলনের ঘোরতর অবস্থা বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইতেছেন– দজ্জাল চতুর্দিকে ভীষণ উৎপাত ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে, "এমতাবস্থায় অকস্মাৎ আল্লাহ তায়ালা মারয়্যাম-পুত্র মছীহ (আঃ)-কে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি অবতরণ করিবেন দামেশক শহরের পূর্বাংশে অবস্থিত (মসজিদের) "মিনারা-বায়জা"– শ্বেত বর্ণের মিনারার উপর। তাঁহার পরণে এক জোড়া রঙ্গিন চাদর থাকিবে। অবতরণকালে তাঁহার হস্তদ্বয় দুইজন ফেরেশতার উপর ভর করিয়া থাকিবে। ক্লান্তির দরুন তাঁহার ঘাম বাহির হইতে থাকিবে– মাথাকে নিচু করিলে ঘামের ফোঁটা টপকিয়ে পড়িবে, আর মাথা সোজা করিলে ঘামের ফোটা মতির দানার ন্যায় বহিয়া পড়িবে।" (মুসলিম শরীফ ২-৪০১)

فَبَيْنَمَا اِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّىْ بِهِمُ الصُّبْحَ اِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحُ فَرَجَعَ ذٰلِكَ الْاِمَامُ يَنْكُصُ يَمْشِىْ الْقَهْقَرٰى لِيُقَدِّمَ عِيْسٰى يُصَلِّىْ فَيَضَعُ عِيْسٰى يَدَهٗ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ تَقَدَّمْ .....

"মোসলমানের তৎকালীন নেতা একদা ফজরের নামায পড়াইবার জন্য অগ্রসর হইবেন, এমতাবস্থায় অকস্মাৎ মারয়্যাম-পুত্র ঈসা ঐ ফজরের সময় অবতরণ করিবেন।* তখন ঐ নেতা যিনি নামায পড়াইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তিনি পেছনের দিকে চলিয়া আসিবেন; যেন হযরত ঈসা আগে বাড়িয়া নামায পড়ান। কিন্তু হযরত ঈসা ঐ নেতার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিবেন, নামায আপনি পড়াইবেন; এই নামায আপনার ইমামতীতেই দাঁড়াইয়াছে। সেমতে ঐ নেতাই নামায পড়াইবেন।" (ইবনে মাজা শরীফ)

এইরূপে হযরত ঈসা ভূপৃষ্ঠে অতরণ করিয়া বহু প্রতিক্ষিত দজ্জালকে বধ করিবেন এবং তিনি দীর্ঘ দিন ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করিবেন। তখন তিনি বিবাহও করিবেন, অতপর তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বরণ করিবেন এবং পবিত্র মদিনায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজা সংলগ্ন স্থানে সমাহিত হইবেন– এই সম্পর্কেও হাদীছ বিদ্যমান আছে। ইমাম বোখারী (রঃ) تاريخ ইতিহাস বিষয়ে একখানা কেতাব লিখিয়াছেন, সেই কেতাবে উল্লেখ আছে–

عن عبد الله بن سلام قال يدفن عيسى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعا .

"ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ছালাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ঈসা (আঃ) হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজা সংলগ্ন স্থানে সমাহিত হইবেন, ফলে রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং আবু বকর ও ওমরের তিনটি কবরের সঙ্গে চতুর্থ কবর হযরত ঈসার হইবে।"

(তাছহীহ বে-মা তাওয়াতারা ফি নুযুলিল মসীহ ৩৮)

* ঈসা (আঃ) আছরের নামাযের সময়ে অবতরণ করিবেন বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং অনেকে লিখিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য হাদীছ দৃষ্টে ফজরের নামায সাব্যস্ত হয়। বোখারী শরীফের শরাহ ফয়জুল বারী চুতর্থ খন্ড ৪৬ পৃষ্ঠায় আছে– আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রঃ) বলিয়াছেন, আলোচ্য হাদীছ মজবুত।

হযরত ঈসা (আঃ) ঐ সময় এক রাজত্বে অন্য রাজার পরিভ্রমণে আসার ন্যায় বিশিষ্ট মেহমানের মর্যাদায় আসিবেন বটে, কিন্তু তাঁহার তৎকালীন অবস্থানকালে নানা রকমের শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে, এতদ্ভিন্ন তিনি অনেক রকমের সংস্কার সাধনও করিবেন। বিশেষতঃ তাঁহার উম্মৎ হওয়ার দাবিদার খৃষ্টানরা শূকর খাওয়ার ও ক্রুশ ধারণ করার যে অবৈধ রীতি-নীতি অবলম্বন করিয়াছে ঐ সবের সংস্কারে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। নিম্নের হাদীছে উহারই উল্লেখ রহিয়াছে–

১৬৫৭। হাদীছ ঃ عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْحَرْبَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لاَيَقْبَلُهٗ اَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُ وْا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا

অর্থঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শপথ করিয়া বলিয়াছেন, একদিন মারইয়্যামের পুত্র তোমাদের মধ্যে অবতরণ করিবেন নেতৃত্ব দানকারী ও সুবিচারক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী রূপে। সেমতে তিনি (খৃষ্টানদের কুসংস্কার মুছিবার জন্য) ক্রুশ ভাঙ্গিবার অভিযান চালাইবেন এবং (খৃষ্টানগণ শূকরকে খাদ্য ও গৃহপালিত পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তিনি ঐ কুসংস্কার উচ্ছেদে) শূকর নিধন অভিযান চালাইবেন। যুদ্ধ-লড়াই-এর পরিসমাপ্তি ঘটাইবেন। ঐ সময় ধন-দৌলতের আধিক্য হইবে, এমনকি উহা গ্রহণকারী পাওয়া যাইবে না, ফলে (সামান্য এবাদত– যথা) একটি মাত্র সেজদা সারা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ-সামগ্রী হইতে উত্তম গণ্য হইবে।

হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রাঃ) উপস্থিত লোকজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা এই প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতখানা পাঠ করিতে পার–

وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ـ

ব্যখ্যা ঃ حكما عدلا নেতৃত্ব দানকারী ও সুবিচারক ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী" অর্থাৎ হযরত ঈসার তৎকালীন আগমন ভিন্ন নবী ও ভিন্ন শরিয়তের বাহকরূপে হইবে না, বরং তিনি ব্যক্তিগতবাবে নবী থাকিবেন বটে, কিন্তু তখন তিনি হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীয়ত মোতাবেক ফয়সালাকারী এবং সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচার দূর করিয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারীরূপে আগমন করিবেন।

এ সম্পর্কে হাদীছও বর্ণিত আছে যে ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد على ملته "মারইয়্যাম-পুত্র ঈসা অবতরণ করিবেন মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত দ্বীন-ধর্ম সমর্থনকারী, তাহারই শরীয়তের পাবন্দরূপে।" (ফতহুল বারী ৬–৩৮৩)

"فيكسر الصليب ক্রুশ ভাঙ্গিবার অভিযান চালাইবেন।" অর্থাৎ খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা সম্বন্ধে মিথ্যা ঘটনা গড়িয়া নিয়া সেই অবাস্তব ঘটনা সূত্রে ক্রুশ ধারণের রীতি অবলম্বন করিয়াছে, ক্রুশের ভক্তি প্রণাম অবলম্বন করিয়াছে, উহাকে পূজনীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছে। হযরত ঈসা স্বয়ং এই শেরেকী কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধন করিবেন, ক্রুশের প্রভাব সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিবেন। এমনকি বাহ্যিক রূপেও ক্রুশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করতঃ ভূপৃষ্ঠ হইতে উহাকে মুছিয়া ফেলার অভিযান চালাইবেন।

"ويقتل الخنزير শূকর নিধনের অভিযান চালাইবেন"। কোন নবীর শরীয়তেই শূকর হালাল ছিল না। হযরত ঈসার শরীয়তেও মুকর হারাম ছিল, কিন্তু খৃষ্টানরা তাহাদের শরীয়ত বিকৃত করিয়া মুকর খাওয়া অবলম্বন করিয়াছে, এমনকি গরু-ছাগলের ন্যায় শূকরের লালন-পালন, কেনা-বেচা অবলম্বন করিয়াছে। ঈসা

(আঃ) শূকর নিধনের মাধ্যমে উক্ত কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিবেন।

"ويضع الحرب" যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটাইবেন"। ইহা এইরূপে হইবে যে, সেই সময় হযরত ঈসার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টায় ভূপৃষ্ঠে ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই বিষয়টি হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে–

ويهلك الله فى زمانه الملل كلها الا الاسلام ـ

"হযরত ঈসার অবতরণ সময়ে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ভিন্ন সব ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দিবেন" (আবু দাউদ শরীফ)

وتملا الارض من المسلم كما يملا الاناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد الا الله تعالى ـ

"ভূপৃষ্ঠের আবাসিক অংশ মুসলিম জাতিতে পূর্ণ থাকিবে (উহাতে অন্য কাহারও স্থানই থাকিবে না) যেরূপ কানায় কানায় পানি ভরা পাত্রের অবস্থা হয়।" তখন সারা বিশ্ববাসীর একই কলেমা হইবে, ভূপৃষ্ঠে এক আল্লাহ ছাড়া আর কিছুর এবাদত হইবে না। (ঐ)

মোসলেম শরীফে আছে, ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد "হযরত ঈসার অবতরণ কালে আল্লাহর কুদরতের একটি লীলা এই প্রকাশ পাইবে যে, সারা বিশ্ববাসীর মধ্যে সদ্ভাবের সৃষ্টি হইয়া সকল প্রকার বিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা মুছিয়া যাইবে।" ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান স্বাভাবিকরূপেই হইয়া যাইবে।

"ويفيض المال" মালের আধিক্য হইবে" মালের আধিক্যের একটা সাধারণ সূত্র এই হইবে যে, জুলুম-অন্যায়, অত্যাচার দূরীভূত হইয়া ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন সকল প্রকার বরকত ও রহমত অবতীর্ণ হইবে, এতদ্ভিন্ন ভূ-গর্ভস্থ খনিজ পদার্থ স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি ভূ-পৃষ্ঠে চালিয়া আসিবে। (ফতহুল বারী ৬–৩৮৩)

"حتى لا يقبل احد" মাল গ্রহণকারী পাওয়া যাইবে না' ইহার এক কারণ ত সাধারণ্যে মালের আধিক্য; এতদ্ভিন্ন সব রকম নিদর্শন দৃষ্টে সকলের অন্তরেই কিয়ামতের ভাবনা জন্মিবে, ফলে ধন-লিপ্সা থাকিবে না। (ফতহুল বারী ৬–৩৮৩)

"حتى تكون السجدة الواحد خير ...." তখন এক একটি সেজদা সারা দুনিয়া ও উহার সম্পদ হইতে উত্তম গণ্য হইবে। কেয়ামতের নিকটবর্তীতা বোধে মানুষের অন্তরে দুনিয়ার প্রতি বৈরীভাব সৃষ্টি হইয়া আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে; ফলে মানুষ এবাদতের প্রতি অধিক আগ্রহশীল হইয়া উঠিবে। কিন্তু ধন-দৌলত গ্রহণকারীর অভাবে দান-খয়রাতের দ্বারা আখেরাতের লাভ হাসিল করার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে, তাই শারীরিক এবাদতের প্রতিটি সুযোগ মানুষের নিকট সর্বাধিক মূল্যবান পরিগণিত হইবে। (ঐ)

ثم يقول ابو هريرة واقرءوا ان شئتم .....

আলোচ্য হাদীছ বর্ণনান্তে আবু হোরায়রা (রাঃ) এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করিলেন–

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ـ .....

(হযরত ঈসার অবতরণের পর স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে যে, ইহুদীগণ যে সব অপবাদ রটাইয়াছিল, নাছারাগণ যে– তাঁহাকে খোদার বেটা বানাইয়াছিল এবং তাহারা উভয়ে তাঁহার শূলীবিদ্ধ হওয়ার যে কল্পিত কাহিনী গড়াইয়াছিল– সবই ছিল মিথ্যা। ঐ সময় স্বয়ং হযরত ঈসার মাধ্যমে তাহারা তাহাদের সমুদয় গর্হিত মতবাদের অসারতা এবং এ সম্বন্ধে ইসলামের সমুদয় বিবৃতির প্রামাণিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া সমবেতভাবে ইসলামের ছায়াতলে আসিয়া যাইবে। এইভাবে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসার (ভূপৃষ্ঠে অবতরণের পর, তাঁহার স্বাভাবিক) মৃত্যুর পূর্বেই (তাঁহার সম্পর্কীয় সকল প্রকার মিথ্যা কল্পনার অবসান

ঘটিয়া, কল্পনা প্রণয়নকারী) ইহুদী-নাসারা দলের (তৎকালীন) প্রতিটি লোকই তাঁহার সম্পর্কে খাঁটি তথ্য-জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভের সুযোগ পাইবে।

আর কেয়ামতের দিন ত স্বয়ং হযরত ঈসা আল্লাহর দরবারে ঐ কেতাবধারী ইহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট সাক্ষ দিবেনই। (ইহুদীগণ যাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ত স্বাভাবিকই; সকল নবীই কেয়ামতের দিন অস্বীকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিবেন। এতদ্ভিন্ন হযরত ঈসা তাঁহার দলভুক্ত হওয়ার দাবীদার নাছারা খৃস্টানদের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিবেন; যাহা পূর্বে ছুরা মায়েদার আয়াতে উল্লেখ হইয়াছে।)

আবু হোরায়রা (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের উল্লেখ করিয়া মূল হাদীছের বিষয়বস্তুর প্রামাণিকতাই দেখাইয়াছেন যে, হযরত ঈসার মৃত্যু ঘটে নাই, তিনি পুনঃ অবতরণ করিবেন এবং তখন তাঁহার মৃত্যু হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার সম্পর্কে প্রধান কুসংস্কার ক্রুশের কাহিনীর মূলোচ্ছেদ করিবেন; তখন সকলে ঐ সব মিথ্যা ত্যাগ করতঃ খাঁটিভাবে মুসলমান হইয়া তাঁহার সম্পর্কে সত্যের প্রমাণ স্থাপন করিবেন। সকলে খাঁটি ঈমানদার হইলে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা আখেরাতের জন্য এবাদতের প্রতি অধিক আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে।

১৬৫৮। হাদীছ ঃ ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ـ

অর্থ ঃ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কতই না সুন্দর হইবে তোমাদের অবস্থা তখন, যখন তোমাদের মধ্যে অবতরণ করিবেন মরয়্যামের পুত্র ঈসা (আঃ) এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হইতে হইবেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত ঈসা আলাইহিচ্ছালামের অবতরণের পর বিশ্বের অবস্থা সব দিক দিয়াই ভাল হইয়া যাইবে– দ্বীনের দিক দিয়া, একমাত্র ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া সব রকম বে-দ্বীনী মুছিয়া যাইবে। শান্তির দিক দিয়া, সারা বিশ্ব এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইয়া যাইবে; বিবাদ-বিসম্বাদ, হিংসা-বিদ্বেষ মুছিয়া যাইবে। ধন-সম্পদের দিক দিয়া সকলেই ধনী হইয়া যাইবে, এমনকি দান-খয়রাত গ্রহণকারী লোক পাওয়া যাইবে না। খাদ্য দ্রব্যের দিক দিয়া, জমিন তাহার উৎপাদনশক্তি সম্পূর্ণ প্রকাশ করায় সব রকম খাদ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখা দিবে।

হযরত ঈসা (আঃ) ঐ সময় দুনিয়াতে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবেন। প্রাথমিক অবস্থায় দাজ্জাল-আন্দোলনের এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন। অল্প দিনেই ঐসব ধ্বংস হইয়া সঙ্কট কাটিয়া উঠিবে, অতপর অনতিবিলম্বেই ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হইবে; তখন অল্প দিনের জন্য সংকটপূর্ণ বনবাসের জীবন কাটাইতে হইবে; তার পরেই আসিবে পূর্বোল্লিখিত শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রাচুর্যতার যুগ।

"وامامكم منكم" এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত আছে। অগ্রগণ্য মত এই যে, এই বাক্যটি হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কীয় বর্ণনা যে, তিনি অবতরণ করিয়া মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন এবং নামাযের ইমামতিও তিনি করিবেন। অবশ্য তিনি ব্যক্তিগতবাবে নবী থাকিলেও তাঁহার তৎকালীন জীবন শরীয়তে-মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

কোন কোন হাদীছে স্পষ্টরূপে উল্লেখ দেখা যায় যে, তিনি ইমাম হইতে অস্বীকার করতঃ ঐ সময় তাঁহার পূর্বে মুসলমানদের নেতা যিনি থাকিবেন তাঁহাকেই নামাযের ইমামতীর জন্য আগে বাড়াইয়া দিবেন। অত্র হাদীছের সামঞ্জস্য উপরোল্লিখিত বর্ণনার সহিত এইরূপে করা হয় যে, এই হাদীছটির মর্ম শুধু এতটুকু যে, উপস্থিত যেই নামাযের জামাত দাঁড়ানকালে হযরত ঈসার অবতরণ হইবে সেই জামাতের ইমামতী তিনি করিবেন না, বরং উপস্থিত নেতার ইমামতীতে ঐ নামায আদায় করা হইবে।

ঈসা (আঃ) অবতরণ করিয়া তাঁহার সর্বপ্রথম বিশেষ কাজ হইবে দাজ্জালকে ধ্বংস করতঃ তাহার বিপর্যয় হইতে লোকদিগকে রক্ষা করা। এইসব তথ্য এবং দজ্জালের বিস্তারিত বিবরণ ইনশা-আল্লাহ তায়ালা সপ্তম খন্ডে বর্ণিত হইবে।

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ ـ

—সমাপ্ত—